KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T. MER LANE, KOLKATA-700009

Card No.: KLMLGK 200	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection: KLML	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number: ২৪/- ২৪/- ২৪/-	Year of Publication: শ্রাবণ ১৩৮৪ // Aug 1977 অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ // Dec 1977 পৌষ ১৩৮৪ // Jan 1978
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

পঞ্চবিংশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ
সুস্থ ও সবল শিশুই জাতির সম্পদ

আজই যে কোন নিকটবর্ত্তী
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
যোগাযোগ করে শিশুকল্যাণ
কর্মসূচীর সুযোগ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থার
মাস মিডিয়া ডিভিসন হইতে প্রচারিত।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা :—১৫৮/৭৭-৭৮

পঞ্চবিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা   পৌষ তের'শ' চুরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচী-পত্র

রামায়ণ প্রসঙ্গ ॥ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ৩৩১

শতভাষী ও চিত্রজল্পক কবি অমরু ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৩৩৭

স্তম্ভ ॥ চিত্ররেখা গুপ্ত ৩৪৬

চারিদিকে শুধু জল ॥ হেমন্তকুমার সরকার ৩৪৯

শবর লোঢ়া : একটি আদিবাসী সম্প্রদায় ॥ নিত্যরঞ্জন বসু ৩৫২

সমালোচনা : স্মৃতির অতলে ॥ নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৩৫৪

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিণ্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা-কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'।

লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-হরফে লিখে দেবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা 'শিল্প', 'দর্শন', 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

পৌষ
তেরশ' চুরাশী

সমকালীন

৯ম সংখ্যা
পঞ্চবিংশতি বর্ষ

রামায়ণ প্রসঙ্গ

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

পরলোকগত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বাংলাদেশের সারস্বত-সমাজ নতুন করে ঋণী। কারণ রামায়ণ সম্পর্কীয় বিতর্কের সৃষ্টি করে তিনি বাংলাদেশে বহুকাল অপ্রচলিত রামায়ণ চর্চাকেই আবার নতুন করে উদ্বোধিত করেছেন। ৺অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বহুবিতর্কিত অভিমতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের যে পাঠটি প্রচলিত সেটি রামায়ণের মূল পাঠ নয়। মূল পাঠটি আজও বৌদ্ধজাতকের কাহিনীর মাধ্যমে বেঁচে আছে এবং এই পাঠের সারমর্মরূপে বলতে হয় যে ইক্ষাকুকুললক্ষ্মী সীতাদেবী ছিলেন অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের সহোদরা ভগ্নী। ভাষাচার্য তাঁর এই অভিমতকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার আগেই মর্তধাম পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য এই অভিমতের সর্বাঙ্গীন বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের যে ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মূল্য অপরিসীম। ভারতবর্ষে রামায়ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনাই প্রধানতঃ দুটি ধারাকে অনুসরণ করেছে। একটি হল পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় বিচারের ধারা অপরটি বৌদ্ধসাহিত্য ও কিম্বদন্তীমূলক বিচারের ধারা। ৺অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এই শেষোক্ত ধারাকে অবলম্বন করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রধান উপজীব্য হয়েছে দশরথ জাতকের কাহিনী। দশরথ জাতকের রামকাহিনীকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়।(১) "অযোধ্যার নৃপতি দশরথের চার মহিষী ছিলেন। প্রথমা মহিষীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পণ্ডিতের জন্ম হয়। প্রথমা মহিষীর অকাল মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী সম্রাজ্ঞী পদ লাভ করেন। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। এই সন্তানের নাম হয় ভরত। ভরতের সাত বৎসর বয়সের সময় রাণী প্রার্থনা করেন যে দশরথের পর ভরতকে যেন সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। দশরথ এই প্রার্থনা পূরণে

অসম্মত হন এবং তিন পুত্রকে ডাকিয়া কৈকেয়ীর এই অভিমত তাহাদের জানাইয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাহাদের বনে পাঠান। বনে পাঠাইবার সময়ে দশরথ তিন পুত্রকেই জানান যে তাঁহার এখনো ১২ বৎসর আয়ু অবশিষ্ট আছে সুতরাং তিন পুত্র যেন ১২ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সীতা রামের সহোদরা ভগ্নী। তিনিও রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে যাত্রা করেন। পুত্রদের বনগমনের নয় বৎসর পরে দশরথ দেহত্যাগ করেন। তখন কৈকেয়ী ভরতকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলে অমাত্যবৃন্দ মিলিতভাবে তাহাতে বাধা দেন। ভরত স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করেন। রামচন্দ্রের কাছে গিয়া তাঁহাকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানাইলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে পুষ্করিণীর জলে দণ্ডায়মান রাখিয়া তাহার পর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানাইলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সীতা ও লক্ষ্মণ সহসা শোকে অভিভূত না হইয়া পড়ে। রামচন্দ্র কোনমতেই অযোধ্যায় ফিরিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা লইয়া দেশে ফিরিলেন। এই পাদুকা দুইটি অলৌকিক উপায়ে দেশ শাসন করিত। কোন অহিতকর অথবা বিরোধী সিদ্ধান্ত হইলে পাদুকা দুইটি পরস্পরকে আঘাত করিত। মন্ত্রীরা তাহা হইতেই রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইতেন। রামচন্দ্র ১২ বৎসর পূর্ণ হইলে দেশে ফিরিলেন এবং সীতার সহিত মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ হইল।"

দশরথ-জাতকের এই কাহিনীর যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের আগে রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি নিরূপণ করা প্রয়োজন। বেদে (২) রাম ও লক্ষ্মণ এই দুইটি নাম পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে রামায়ণ বর্ণিত কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। ভরত পদটি যেখানে বিশেষ একটি জাতির সূচক ও সীতা লাঙ্গলের ফলারূপে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণেই সর্বপ্রথম দশরথ রাজা, দশরথপুত্র রামচন্দ্র ও মিথিলা-নৃপতি জনকের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদে জনক রাজার সভার সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা এই নামগুলিও বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণী কথার মূল সূত্র সেখানেও পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাব্য সময় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ এবং ভারতীয় রক্ষণশীল পণ্ডিত সম্প্রদায় খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দরূপে নির্ধারিত করেছেন। মহাভারতে সভাপর্বে, বনপর্বে, নলোপাখ্যানপর্বে, বনপর্বের অন্তর্ভুক্ত তীর্থযাত্রাপর্বে, ঘোষযাত্রাকাহরণপর্বে ও অরণ্যপর্বে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতার অপহরণ ও রাবণের মৃত্যু এই প্রধান ঘটনাগুলিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে রামায়ণের মূল কাহিনীতে সীতা জনক রাজার কন্যা ও রামের স্ত্রী এই ভাবেই পরিচিত ছিলেন। মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে সীতা জনকরাজদুহিতা রূপেই পরিচিতা। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা রাবণ ও হনুমান এই কয়টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) এ থেকে অনুমান করা যায় যে পাণিনির আবির্ভাবের আগে রামায়ণের মূল কাহিনী সম্ভবতঃ জনসমাজে পরিচিত হয়েছিল। পাণিনির পরবর্তীকালে কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্রেও সীতা রামচন্দ্রের স্ত্রী এবং রাবণ তাঁকে অপহরণ করে বিনষ্ট হয়েছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। (৪) সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটাকার ভাস রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীতে কল্পনার আঁড়ে দিয়ে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পঞ্চরাত্রই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু ভাসও তাঁর রামায়ণাশ্রিত অভিনব

কৃতি প্রতিমা নাটকে রামায়ণ কাহিনীর নবরূপ দান করেও সীতার পৌরাণিক চরিত্র বজায় রেখেছেন। ভাসের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতকে হলে সীতার জনকতনয়ারূপে পরিচিতির তখনও অন্যরূপ ঘটেনি। কালিদাসের কাব্যেও বৈদেহীবন্ধু জনকতনয়ার পাণিপীড়ন করেছিলেন বলেই প্রসিদ্ধি। মৃচ্ছকটিক নাটকে শকারের অসংলগ্ন ভাষণে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী ও কিম্বদন্তীর যথেচ্ছ ও কিম্ভূতকিমাকার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু সেখানেও সীতাকে কোনক্রমেই রামের ভগ্নী বলে উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য দশরথজাতকের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। জাতক কাহিনীর অধিকাংশই ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের শতাধিক বর্ষ পরে রচিত হয়েছে। এই কারণে দশরথ জাতকের কাহিনীকে খৃষ্টীয় অথবা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্ববর্তী বলা যায় না। সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীর কোন উল্লেখ না থাকায় এই কাহিনীর উৎস সামাজিক অথবা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনুসন্ধান কর্তে হয়। মানব সভ্যতার বিবর্তনের প্রাথমিক যুগে ভ্রাতা ও ভগ্নীর যৌনমিলনের একাধিক নিদর্শন ভারত ভূখণ্ডেই পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদের যমযমী যুক্ত এর অন্যতম নিদর্শন। আর্যহিন্দু সমাজে এই মিলন নিন্দিত হলেও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন কোন উপজাতির মধ্যে এই প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত রাহুল সংস্কৃত্যায়ণ (৫) যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তা এইরকম: 'উত্তর ভারতে হিমালয় সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে দুর্দান্ত প্রকৃতির এক রাজপুরুষ ও রাজকন্যা ছিল। তাদের অত্যাচারে প্রজারা নিত্যই বিব্রত হতে থাকায় তাদের পিতা এবং রাজ্যের রাজা শেষপর্যন্ত তাদের বনবাসে পাঠান। বনবাসে পাঠানোর কিছুকাল পরে মহারাজের কাছে সংবাদ আসে যে তাঁর এই দুর্দান্ত সন্তানের পুত্র-কন্যার মিলনে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। মহারাজ এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং নবজাতক ও তার পিতামাতাকে নির্মূল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজসভার পণ্ডিতগণ মিলিত হয়ে সবদিক বিচার করে বলেন যে, এই সন্তান "গ্রাহ্যতুং শাক্যঃ" অর্থাৎ গ্রহণ করার যোগ্য। এই দোষ প্রাচীন হিন্দু কুলজীতে 'শাক্যদোষ' নামে পরিচিত এবং রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে মহামতি বুদ্ধদেব যে শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মূল হচ্ছে এই 'শাক্য' গোত্র। (৬) খৃষ্টজন্মের সমকালেও সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে কোথাও রামচন্দ্র সহোদরা ভগ্নী সীতাকে বিবাহ করেছিলেন এমন নজির নেই। পুরাণের সহস্র কিম্বদন্তীর মধ্যে কোথাও সীতা রামের ভগ্নী এমন কথা জানা যায় না। এ থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে শাক্য বংশের উৎপত্তির পেছনে যে দোষ ছিল তাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দেবার জন্যই বৌদ্ধ জাতকের রচয়িতাগণ সুকৌশলে রামচরিতকে এইভাবে পরিবর্তিত করেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক সংঘাতের পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে বৌদ্ধ শাস্ত্রকার ও সাহিত্যিকরা সযত্নে অনেক হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ও তথ্যকে বিকৃত করেছেন। জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রকারগণও একই পথ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিকৃত করার এই সর্বাত্মক প্রয়াসের অন্যতম দিক হচ্ছে এই রামায়ণ কাহিনীর বিকৃতি। দশরথ জাতকের কাহিনী যে নিতান্তই বিপ্রিপ্ত তার প্রমাণ হিসেবে বিশ্বন্তর জাতকের সাক্ষ্য (৫৪৭ জাতক) উদ্ধৃত করা যায়। এই জাতকে মাদ্রীর উক্তি—

"পুরাকালে যেমন সীতাদেবী পতির সঙ্গে বনবাসে গিয়াছিলেন।" এখানে সীতাকে মিথিলা

দেশ জাতা ও জনকতনয়া বলা হয়েছে। উভয় জাতকে (৪৫৮) বলা আছে যে বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করা একমাত্র দাক্ষিণাত্যেই প্রচলিত প্রথা। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জৈন দার্শনিক হরিভদ্র স্থরি তাঁর ধূর্তাখ্যানম্ গ্রন্থে সর্বপ্রকার পৌরাণিক কাহিনীর অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতাকে বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। সীতা রামচন্দ্রের সহোদরা ভগ্নী হলে তাঁদের মিলনের অসামাজিকতা হরিভদ্রের দৃষ্টিকে অতিক্রম করত না এবং রামচরিত্র নিশ্চিন্তভাবেই তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত হত। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকের মধ্যেই রামায়ণ কাহিনী যে বহু পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এই পরিবর্তন যে শাস্ত্রানুগামী হয়নি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনস্বী অভিনব গুপ্ত (৭) তার ধ্বন্যালোক গ্রন্থে নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জনের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। অভিনবগুপ্তের এই সতর্কবাণী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় কৃত রামায়ণী কথার স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষে রামায়ণ কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্ভারতেও তার প্রসার ও পরিচিতি ঘটেছে। বহির্ভারতে (৮) পরিচিত বিভিন্ন রামায়ণ কাহিনী একত্র করে বিচার করলে ভাষাচার্য স্থনীতিকুমারের অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার করা যায়। বৃহত্তর ভারতে রামায়ণ কাহিনী দুইটি পর্যায়ে প্রচলিত হয়েছে। প্রথম ধারায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত, খোটান, সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়া হয়ে রাম-কথা চীন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিব্বতী রামায়ণ কথায় দেখা যায় সীতা রাবণের কন্যা। কৃষকরা তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় কৃষি ক্ষেত্রে দেখতে পায় ও তাকে বনবাসী রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে। প্রাপ্ত বয়স্কা হলে রামচন্দ্র তাকে বিবাহ করেন। এই কাহিনীতে দশরথ, জনক রাজা, লক্ষ্মণ, মন্দোদরী এদের কোন উল্লেখ নেই। খোটান দেশীয় রামায়ণে দেখা যায় সীতা রাবণের কন্যা। জন্মের পর সীতাকে একটি পেটিকায় আবদ্ধ করে সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সেই পেটিকা ঘটনাচক্রে যুবরাজ রামচন্দ্রের হস্তগত হয়। সীতা রাজ অন্তঃপুরে প্রতিপালিতা হন। যৌবনে সীতার সৌন্দর্যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ উভয়ে মুগ্ধ হন এবং উভয়ে সীতাকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক বেইলীর মতে এই খোটান দেশীয় কাহিনী খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পরবর্তী। চীনদেশে রামায়ণ কথার দুইটি ভাষান্তরণ আছে। এই দুইটি বৌদ্ধ জগতের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সীতা ও রামের সম্বন্ধ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। দুইটি ভাষান্তরণেই রামচন্দ্রের অনুরূপ এক রাজা ও সীতার অনুরূপ এক রাণীর উল্লেখ আছে। এর অন্যতম অনুবাদে হনুমানের প্রতিরূপ হিসাবে এক বানর নৃপতির আখ্যান পাওয়া যায়। মঙ্গোলীয় ও সাইবেরীয় অনুবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যেও রাম ও সীতার সম্বন্ধ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিংহলদেশে রামায়ণের যে কাহিনী প্রচলিত অনেকাংশে বাল্মীকী রামায়ণের অনুগামী। এই রামায়ণ কথায় সীতা জনকরাজ কন্যা ও রামচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রামায়ণ কাহিনী নানাভাবে পরিচিত। এই কাহিনীগুলিতে মূল রামায়ণ বর্ণিত ঘটনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে ও নতুন ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলিও স্থানীয় প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যবদ্বীপের অন্তর্গত বিখ্যাত ভাস্কর্য নিদর্শন বোরোবদুরে মোট ২৩টি জাতকের আখ্যান উৎকীর্ণ আছে। তার মধ্যে দশরথ জাতকের কাহিনী উৎকীর্ণ দেখা যায়। যবদ্বীপে ও মালয়দেশে রামায়ণ কাহিনী বিশেষ প্রচারিত। কিন্তু এই

দুই কাহিনীতেই মন্দোদরীকে রামের মাতা ও সীতাকে মন্দোদরীর কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাম ও সীতা উভয়ে মন্দোদরীর পুত্র কন্যা হওয়ায় সীতাকে রামের ভগ্নী বলা চলে। লাওস দেশে রামায়ণের একটি পরিবর্তিত ভাষান্তরণ পাওয়া যায়। এই ভাষান্তরণ অনুসারে সীতা রাবণের কন্যা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সীতা রাবণকে হত্যার চেষ্টা করেন। তখন রাবণ সীতাকে একটি মঞ্জুষায় আবদ্ধ করে জলে নিক্ষেপ করেন। ঘটনাচক্রে সীতা নদীপথে মিথিলাদেশে উপস্থিত হন। যৌবনে উপনীত হবার পর রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেন। এই কাহিনী ছাড়াও লাওস দেশে বৌদ্ধ প্রভাবে রচিত একটি রামজাতক পাওয়া যায়। এই জাতকে দশরথরাজার কন্যা শান্তার উল্লেখ আছে। এতে আরও বলা আছে যে স্বয়ং শচীদেবী প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অবতীর্ণ হন রাবণের কন্যারূপে মন্দোদরীর গর্ভে। জ্যোতিষীর সতর্কবাণী অনুসরণে রাবণ এই নবজাতিকাকে পরিত্যাগ করেন।

বহির্ভারতে রামায়ণী কথার এই সমুদয় ভাষান্তরীকরণ গুলিকে একত্র করে বিচার করলে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতক থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টিয় পঞ্চদশষোড়শ শতকের মধ্যে তিব্বত, খোটান, যবদ্বীপ, মালয়, ও লাওস এই সমস্ত দেশে রামায়ণের যে কাহিনী প্রচলিত হয়েছে তাতে সর্বত্রই সীতাকে রাবণের কন্যা এবং মাত্র ২।১টিতে সীতা ও রাম উভয়কেই মন্দোদরীর সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। খৃষ্টিয় দশমশতকে যোগীশ্বর নামে একজন লেখক প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রাম কাকাবিন্ নামে একটি রামায়ণকথা রচনা করেন। অধ্যাপক **Hookaas**এর (৯) মতে এই গ্রন্থ প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ কথা ও ভর্তৃহরি রচিত রাবণবধ মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই রাম কাকাবিনে রামকথা স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত হলেও এতে সীতা রামচন্দ্রের সহোদরা এমন কোন উল্লেখ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি দেশে রামকাহিনীর এই পরিবর্তন ঘটলেও চম্পাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মূল রামায়ণী কথারই বিশ্বস্ত অনুসরণ দেখা যায়। চম্পাদেশের শিলালিপির মধ্যে রামায়ণের তথাকথিত প্রক্ষিপ্ত অংশেরও প্রচুর উল্লেখ আছে। এই শিলালিপিগুলি খৃষ্টিয় সপ্তম অষ্টম শতকের অন্তর্বর্তী। কাম্বোডিয়ায় পাওয়া খৃষ্টীয় দশম শতকের রাজেন্দ্র বর্মণের শিলালেখে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—"অযোনিজাং যো জনকোপনীতাং সীতাং সতীং রাম ইবোদ্বুবাহ।" অর্থাৎ অযোনি সম্ভবা সীতাকে জনকরাজা রামের সঙ্গে বিবাহ দেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম অভিপ্রয়াণ ঘটে খৃষ্টীয় ১ম শতকে সম্ভবতঃ গুজরাট থেকে। অবশ্য এর আগে সিংহলে বঙ্গদেশ থেকে বিজয়সিংহের বিজয় অভিযান ঘটেছিল। দঃ পূঃ এশিয়ার ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু সংস্কৃতির সঞ্চরণ প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় নবম দশম শতক পর্যন্ত চলেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতক থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ ও অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধসংস্কৃতি সমানভাবে প্রচলিত ছিল। রামায়ণের মূল কাহিনীর পাশে পরিবর্তন ও কাহিনীর অস্তিত্ব রামায়ণ প্রসঙ্গের চেষ্টাকৃত পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার খৃষ্টীয় অষ্টম-দশম শতকে এই পরিবর্তন দেখা গেলে তার ভারতীয় উৎস অবশ্যই কয়েকশতক পূর্ববর্তী একথা মেনে নিতে হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে পূর্বভারতে যে সকল পুরাণ সঙ্কলিত হয় তাদের মধ্যে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা থেকে অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

সীতার রাবণকন্যা রূপে প্রসিদ্ধি এই পূর্বভারতীয় সংযোজনেরই ফল। পূর্বভারত হতে জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পথে রামায়ণ কথার এই পরিবর্তিত রূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংক্রামিত হয়েছে এমন মনে করা হয়ত অসমীচীন নয়। তিব্বত, খোটান, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশেও রামায়ণ কথার প্রচলন বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের অঙ্গরূপেই ঘটেছিল। কিন্তু এই সমুদয় রামায়ণ কথার সঙ্গে দশরথ জাতকের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। দশরথজাতকে সীতা দশরথেরই কন্যা ও রাবণচরিত্র সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। বহির্ভারতে প্রচলিত রামায়ণে মূল চরিত্রগুলিকে কোন না কোন-প্রকারে উল্লিখিত দেখা যায়। দশরথজাতকের কোন অন্তর্ভারতীয় অথবা বহির্ভারতীয় রূপ পাওয়া যায় না। দশরথজাতক ও রামায়ণ কাহিনীর সর্বতোমুখী বিশ্লেষণ থেকে একটি সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতে কোন রাজ্য বা রাজপরিবারে সহোদর ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরবর্তীকালে এই প্রথার একটি সর্বজনগ্রাহ্য ঐতিহাসিক রূপদানের চেষ্টা থেকেই দশরথজাতকের সৃষ্টি হয়।

ইতিহাসের সহস্র ভাঙাগড়ার মধ্যেও রামচরিত যুগে যুগে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশিত করে চলেছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের রামায়ণ-বিতর্ক সেই পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের রামলীলারই যেন পুনরাবৃত্তি। এজন্য আদি কবির সেই শাশ্বত বাণীই সত্য বলে মনে হয়

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়, সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচলিষ্যতি॥"

১। ঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত 'জাতক' দ্রষ্টব্য।
২। Vedic Index Vols I & II.
৩। India as known to Panini—দ্রষ্টব্য।
৪। রাবণঃ পরদারানভিমর্শন্···Bk I. ch, II.
৫। Words of R. Sankrityayana vol, III. Patna.
৬। Prof. Brough তাঁর গোত্রপ্রবর মঞ্জরী গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।
৭। ধ্বন্যালোক তৃতীয় উদ্যোত, বৃত্তি ১১ সংখ্যক।
৮। Ramayana in Greater India—Dr. V. Raghavan দ্রষ্টব্য।
৯। The Old Javanese Ramayana—C, Hookyas.

শতভাষী ও চিত্রজল্পক কবি অমরু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক শক্তি সাবয়ব কি নিরবয়ব তা কে বা জানে, কিন্তু জাতীয় জীবনে রসানুভূতির অবলম্বন যে সাহিত্য, তার রস কিন্তু লৌকিক জীবনের দুয়ারে এসেই ভোগ করতে হয়, তাকে শিব দুর্গা, কৃষ্ণ, রাধা, শ্যামা, কালী এমনি কিছু বিশেষ্য বিশেষণে মুড়ে দিলেই হলো।

অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্ব যখনি সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, তখনি নিরাকার নিরবয়ব তত্ত্বকে সাবয়ব মানবীয় মূর্তি ধারণ করিয়ে তারপর তার রসানুভূতির সঞ্চার করতেই হয় সাহিত্যিককে। তা, সে সাহিত্যিক ভক্তই হোন, সাধকই হোন বা দার্শনিক হোন।

অতএব রূপ, রস অলংকার যোজনা করেই যখন সামাজিকদের হৃদয়ে রস সঞ্চার করার কৃতিকর্ম সাহিত্যকদের তখন ও সব অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক টলৌকিক বুলি ছেড়ে সোজাসুজি লৌকিক জীবনের মানবীয় মনের গতি প্রকৃতি জানলেই তো রসানুভূতি ভাল হয়; একথা কোন চার্বাকের নয়। এটা সপ্তম শতাব্দীর কবি অমরুর।

তখন ও জয়দেবের জন্মই হয় নাই, বেশ কিছুদিন আগে চলে গিয়েছেন মহারাষ্ট্রের কবি হাল, (৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে), কবি ঘটকর্পর (আনুমানিক ৫ম শতাব্দী কবি ভর্তৃমেঠ (ষষ্ঠ) কবি ময়ূর (৬২৫) আর আর কবি ভর্তৃহরি (৬৫০ খ্রীঃ)।

এঁদের রচনাবলিতে শৃঙ্গার রসের মুখ্যত্ব খুব বেশী না থাকলেও শৃঙ্গার রসকে বাদ দেওয়াও হয় নাই, যেহেতু রসই প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত তাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কোন প্রাণের প্রকাশই হয় না শৃঙ্গার ব্যতিরেকে। যেখানেই প্রাণের স্নেহ, সেখানেই শৃঙ্গার। আবার দেহ প্রাণের বিনষ্টি সাধনেও শৃঙ্গার; কিন্তু সে শৃঙ্গারে আস্বাদন নাই, সৌন্দর্যও নাই।

বৈরাগ্যে প্রীতি থাকলেও সেটা শৃঙ্গার রসেরই প্রীতি, কিন্তু দেহ প্রাণে নিরাসক্তি থাকলে শৃঙ্গারের মৃত্যু, আবার উৎকট ভোগলালসায় দেহ প্রাণের বিনাশ ঘটালেও শৃঙ্গারের মৃত্যু। অতএব শৃঙ্গার রসই আদি রস।

কবি অমরু দেখেছেন শৃঙ্গার রসময় এই বিশ্বটায় প্রাণের আকৃতি যেখানেই আছে, সেইখানেই অব্যক্ত শৃঙ্গার রসটি ব্যক্ত হয়ে, অথণ্ড রসকে খণ্ডাকারে তরঙ্গায়িত করছে। বৃক্ষলতাদিতে যে কুসুমোদ্‌গম তাও সেই শৃঙ্গার রসেরই তরঙ্গ। ওই যে অগণ্য অধম্য কীট পতঙ্গাদি তাদের মধ্যেও সেই শৃঙ্গার রসের সঞ্চার এবং বিলাস অহরহঃ চলছে।

যা দেখি, যা অনুভব করি মানব মানবীতে তাই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বিশ্বের প্রতিটি দেহপ্রাণে। যা চিরকালীন, তাই সমকালীন। অথবা যা সমকালীন তাই চিরকালীন।

ভাষার জগতে থাকি, তাই ভাষার অবলম্বন ছাড়া অপরের দেহপ্রাণের শৃঙ্গার রসের ইঙ্গিত আলাপন বুঝতে পারি না, অর্থাৎ আমরা স্বেদজ, উদ্ভিজ দেহের প্রাণের ভাষা বুঝি না, কিংবা অণ্ড অণ্ডজ, (সরীসৃপ, মৎস্য, পক্ষী) জরায়ুজ প্রাণীর ভাষা বুঝি না, কিন্তু প্রাণের অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যে অনুধাবন করলে বুঝি, বিশ্বজুড়ে প্রাণের স্পর্শ জাগাচ্ছে শৃঙ্গার রস।

লতিকার পাশে বৃক্ষের অবস্থান, কিংবা গুল্মের পাশে লতিকার কানাকানি অথবা পক্ষী পক্ষিণীর কাকলি, কিংবা একটি পিপীলিকা তার নিকটতম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে যে তার চলাফেরা সেখানেও রয়েছে সেই শৃঙ্গার রসের মাধুরী সঞ্চার, অথবা শৃঙ্গার ভিত্তিক অন্যান্য রসের অনুকূল প্রতিকূল সঞ্চার।

কবি অমরু একশটি কবিতা লিখে তাদের মাধ্যমে শৃঙ্গার রসের যে কতকগুলি ঠিকানা এবং কি কি অবলম্বনে কতগুলি তার সংকেত সৃষ্টি হয় মানব মানবীর মনে, তাই দেখিয়েছেন। এই রস সঞ্চারই প্রতিটি দেহ মনে অবিরত ধারায় চলেছে অহরহঃ। শ্রেষ্ঠ আলংকারিক ও কবি জগন্নাথের ভাষায় বললে বলা যায়—

বৈরাগ্য মুখকোশ মপসৃত্য স্বরূপং
প্রকটয় সখে।
অতীন্দ্রিয় প্রীতি নিবহস্ত্ব স্বাত্মানং
আবেশয়তি মুহুর্মুহুঃ॥

অর্থাৎ ওহে! বৈরাগ্যের মুখোসটা খুলে একবার স্বরূপটা প্রকট করে বলতো! ঐ যে অতীন্দ্রিয় প্রীতির প্রবাহ ধারা বলে বলছো, তাকি তোমার শৃঙ্গার রসেই মগ্নতা ঘোষণা করছো না, বারবার? দেহে, আশ্রমে, বেশভূষায় প্রীতিইতো শৃঙ্গার রসের কেতন।

অমরুর সমগ্র কবিতা রাজিতে দেহ ও প্রাণের লাবণ্যই প্রকাশিত হয়েছে।

যদি প্রশ্ন ওঠে অমরুর কাব্যমালায় তা হলে কি আছে? এক কথায় উত্তর হলো—শৃঙ্গার রসময় বিশ্বের কথা কওয়া নর নারীর মুখে দেহ প্রাণের সম্পর্কের যেগুলি গোড়ার কথা, তাই আছে।

অমরুর কাব্যমালা পাঠ করতে করতে মনে হবে শৃঙ্গার রসময় বিশ্বে অমরুর অনুভূতিই বুঝি খেলা করছে, তার বাইরে আর বলার কিছুই নাই,—সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না, বিস্ময় থেকে আরম্ভকরে বিরহ, মান, দ্বন্দ্ব বিধা, লজ্জা, ঘৃণা, সঙ্কোচ, বিতৃষ্ণা, আবেগ, প্রতীক্ষা, পুলক, উচ্ছ্বাস, উৎকণ্ঠা, স্মরণ মনস্তাপ, কলহ, ঔদাস্য, আক্ষেপ প্রভৃতি সাপেক্ষিক মানস বৃত্তিগুলি যে যে প্রতিবেশে উদিত হয়, শমিত হয়, দমিত হয়, সেগুলির প্রায় সবই আছে, অর্থাৎ দেহপ্রাণের সম্মেলনে আমাদের মন সর্বদা আমাদিকে যে রসলাবণ্যের মাধুর্য এবং আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, সেই মনের রূপ কখন কিভাবে ব্যক্ত হয় ভাষায়? এই যেমন জীবন সঙ্গিনীর প্রথম জীবনে যে সরলতা প্রকাশপায় স্বামীর আচরণে, তাতে ফাটল ধরিয়ে মজা পাওয়ার মত বান্ধবী তো থেকেই থাকে অনেকের। হয়তো বা বান্ধবীটির শুধু মজা পাওয়াই নয়, নিজেরই বাঞ্ছিত ছিলেন সেই বান্ধবীর স্বামীটি, কিন্তু কোন কারণে তা ঘটেনি, তাতে আক্রোশটা চাপা থেকে যায় মনে, ফুটেও ওঠে সময়ে, সময়ে, তখন হাতের কাছে পায় ঐ বান্ধবীকে; তিনি এমন ভাবে তাঁর স্বামীর প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে দেন যে, এতে তিনি শুধু হিতৈষিনী। বান্ধবীর স্বামীটির—একটু দেরী করে বাড়ি ফেরা কিংবা কারোর বাড়ীতে গিয়ে ছাত্রীর শিক্ষকতা করা অথবা কোন দুঃস্থার সংসারে কিছু সাহায্য করার ব্যবহারে বান্ধবীর স্বামীটি নিঃসন্দিগ্ধ চরিত্র নন। তেমনি সন্দেহ জাগিয়ে তোলার পর বান্ধবীটি প্রথম জীবনে যে ধাক্কা খান, তাকেও অভিমান বলা যায়। এযেন স্বামীর প্রথম অপরাধ তাই—

সা পত্যুঃ প্রথমাপরাধ সময়ে সখ্যোপদেশং বিনা
নো জানাতি সবিভ্রমাঙ্গ বলনা বক্রোক্তি সংসূচনম্
স্বচ্ছৈরচ্ছ কপোল মূলগলিতৈঃ পর্যস্ত নেত্রোৎপলো
বালা কেবলমেব রোদিতিলুঠৎ লোলালকৈরশ্রুভিঃ।

অর্থাৎ তেমন ঘটনা ঘটলে, বধুটি কি কোন প্রতিবাদ করে? না, তা করে না, আর সেই সাজা বান্ধবীর সহৃদয় উপদেশেই তখন সে অভিমান জানায় চোখের জলে, যে চোখদুটির চার পাশে মাথার আলু থালু চুলগুলি ঘিরে থাকে, আর দুটি গালবয়ে জল গড়াতে থাকে। সে অভিমান জানাবার ভাষাও জানেনা, কুটিল চাউনিতে ধমক দিতেও জানেনা, কোন বাঁকা ভাব দিয়ে চোখের চাউনিতে খোঁচা দেওয়া ও জানেনা।

অমরুর এই বর্ণনাটি মানব মানবীর বুদ্ধি কেন্দ্রের সঙ্গে স্থায়ীরতিকে মন কি ভাবে গেঁথে রাখে তারই এক চিরায়তন প্রকাশ।

ভারতের সুপ্রাচীন মনস্তাত্ত্বিক 'ভরত' তিনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দেখিয়েছেন মানব মানবীর মনের গতি অফুরন্ত মনে হলেও আসলে তার স্থায়ী রতি এই নয়টিতেই, এই নয়টি কেন্দ্র থেকেই দেহ মনের গতি চেষ্টা বিকাশ পায়। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম ম্যাকডুগ্যাল বলেন মনের সহজাত বৃত্তিগুলির সংখ্যা চৌদ্দ।

(ভরত)—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপসা, বিস্ময়, নির্বেদ। আর ম্যাকডুগালের অনুশীলনে আরও পাঁচটি আছে অর্থাৎ ঐ নয়টি তো থাকেই তাছাড়া গর্ব, সঙ্গ, ক্ষুধা, সঞ্চয় ও সংগঠন প্রবৃত্তি।

ভরতের ভাবনায় এই পাঁচটিকে উৎসাহের অন্তর্গত করে বিশ্লেষণ করা যায়।

তবে এখানে অমরুর কাব্য চিন্তাটি তাঁর একশত কবিতার মধ্যে এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, একমাত্র রতির অন্তর্গতই মানব মানবীর চিত্তবৃত্তি বা মনোবৃত্তির বিকাশ, অর্থাৎ সেইযে রসধারায় আমাকে বহু রূপে দেখার ইচ্ছা সেই বহুরূপের প্রকাশটা ঘটে রতি কেন্দ্র থেকেই।

ভারতের আলংকারিকদের রতিপরিভাষাটিকে পাশ্চাত্যের 'সেক্স্ ইন্স্টিংট, অথবা উইথ সেক্স্ ইমোসন্' পরিভাষায় বোঝান ঠিক নয়।

ভরতের অভিমত, মনের অনুকূল বাসনাই চিত্তের রতি বৃত্তি, এই বৃত্তির পরিবেশটি নিজেকে ঘিরেই অবস্থান করে, নির্বেদ বা অবসাদ অথবা বৈরাগ্য বা অনাসক্তির কেন্দ্রও মনের অনুকূল বাসনা থেকেই উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ আত্মরতিই সর্বদা অনুকূলতা কামনা করে, তারই নাম 'শৃঙ্গার'।

আত্মরতি শৃঙ্গার যদি একবিশেষ ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে জাগ্রত হয় তবে, সে ভোগের নাম কাম, আর সর্বাঙ্গ ও প্রাণকে স্পর্শকরার প্রবৃত্তি নিয়ে জাগ্রত হয়, তবে তাই হবে আনন্দ।

কামে থাকে মান, অভিমান, ঈর্ষা উদ্বেগ, বিরহ প্রভৃতি সীমিত বৃত্তি। আনন্দে তা থাকে না। ভরতের আলংকারিকগণ এই পার্থক্য বোঝাতেই যে সব অলংকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মনস্তাত্ত্বিক কবি অমরু খণ্ডকাব্যের মাধ্যমে তা সপ্তম শতাব্দীতে শত কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন অর্থাৎ আলংকারিকগণ যে বলেছেন এই যে অপহ্নুতি অলংকার, এটির উৎপত্তি হয় কপটতার কারণ,

এক বিশেষ ইন্দ্রিয় বৃত্তি থেকে যে সীমিত কামনার প্রসার সেটিতে থাকে কৈতব বা কপটতা। সেই কপট বৃত্তিরই অপর নাম অপহ্নুতি

কৈতবাপ হ্নুতি র্ব্যক্তৌ
ব্যাজাত্বৈর্নিহ্নুতেঃ পদৈঃ ॥

রমণীর মান অভিমানের উৎপত্তি হয় রমণের কৈতব বা কপটতা থেকে।

ক্ষেমেন্দ্র (৮ম শতাব্দীর) তাঁর 'কুট্টনীমতং' গ্রন্থে দেখিয়েছেন পুরুষ যখন কপটতা নিয়ে বলে অথবা কোনও কারণে বা অকারণে সন্দিগ্ধ হয়ে বলে প্রিয়ে তুমি আমায় ভুল বুঝেছ ; আমার জীবনে তোমারই অস্তিত্ব, অপর কারোর নয়, তখন পুরুষের এই উক্তিতে কপটতা আছে, মনে করেই গৃহিনী বা বান্ধবী বলেন—

তামেব গচ্ছ যত্ত্রাসক্ত্য
বিলম্বিতোহগতলজ্জ।
বেলা মিয়তীমলমল মেতৈং
অধুনা শঠাহ্নুনয়ৈঃ ॥

অর্থাৎ ওহে নির্লজ্জ ! সেথানেই যাও, যে থানে ডুবে গিয়ে আমার কাছে আসাটা নিতান্ত তুচ্ছ কাজ মনে করেছিলে। এখন সে ত্রুটি সংশোধন করতে অনুনয় বিনয়ের কি প্রয়োজন।

মনের এই পরিবেশটি একেন্দ্রিয় বৃত্তিতেই জাগে। একে সম্ভোগ আখ্যা দিলে ১৪দশ শতাব্দীর ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর কথাই এসে পড়ে—

কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলাৎ নির্লজ্জলজ্জানতো
বস্ত্রান্তংশঠ মুঞ্চ-মুঞ্চ, শপথৈঃ কিং ধূর্ত্ত। বাগ্‌বঞ্চনৈঃ।
খিন্নাহং তব রাত্রি জাগরে বশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াম্
নির্মাল্যোজ্ঝিত পুষ্পদাম নিকরে কাষ্টপদানাংরতিঃ।

অর্থাৎ—ছাড়, ছাড়, আঁচলছাড়, কথার প্যাঁচ দিয়ে শপথ করাও ছাড়, জোরকরে টেনে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বিনয় করে কিছু বলার অভিনয় ও ছাড়। ছিঃ নিলর্জ্জ ! সারা রাত্‌ জেগে থেকে আমার শরীর কেমন করছে, তুমি কি জাননা, ফেলে দেওয়া মালার ফুলে ভ্রমর বসেনা ?

যেটি ভানুদত্তের (১৪ শতাব্দী) মনোবহ স্রোতের ভাষা, তার কত আগে সপ্তম শতাব্দীর কবি অমরুর শতভাষায় মধ্যে একটি উক্তি—

ভ্রুভঙ্গে রচিতেহপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠ মুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়াংঅপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কাকশ্যং গমিতেহপি চেতসিতনু রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতিকথং মানস্য তস্মিনজনে ॥

অর্থাৎ কোন বান্ধবীকে সে বলেছিল—

উঃ তার ব্যবহারে আমার যে কি অবস্থা, তা, তোকে কি বলি, কড়ানজরে ভ্রূ বেঁকিয়ে চেয়েছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল, যেন বেশী করে দেখছি, মনের অবস্থাকে জোর করে চেপে রেখে কথা

বন্ধ করে দেখেছি বুক মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে, দন্তকরে সরে গিয়েও দেখছি কেন যেন শরীরের লোম কাঁটার মত হচ্ছিল, উঃ তার সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়াটা কি সামলান গিয়েছিল ?

এখন এই মনের ক্ষেত্রটি যদি শ্রীরাধা, শ্রীদুর্গা, শ্রীসীতার রূপায়িত হয় তবে কি তা হবে অতীন্দ্রিয় ?

দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রীজয়দেব যে তাঁর গীত গোবিন্দ নামক খণ্ড কাব্যে মানিনী রাধার উক্তি উল্লেখে বৈষ্ণবের লীলা উপাসনার পৈঠা বা সিঁড়ি করে গিয়েছেন তা কি অতীন্দ্রিয় সত্বার অস্তিত্ব বোঝাতে ?

যেমন অষ্টম সর্গের প্রথম দিকটায় মানিনী রাধার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশর জর্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়-বচনং বদন্ত মগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥

অর্থাৎ—গত রাত্রিটা কোন রকমে কাটালেন শ্রীরাধা ভোর ও হলো তখনও জেগে, কিন্তু দেখছেন তাঁর অবস্থান কুঞ্জের দুয়ারে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ, এসেই অনুনয় বিনয়, ক্ষমা প্রার্থনা করছেন ; এদিকে শ্রীরাধার দেহ মন বিশেষ কামনায় জর্জরিত হলেও বিদ্বেষ বশতই বলতে শুরু করলেন—

রজনি জনিত গুরু জাগর রাগ কষায়িতং
অলস নিমেষং
বহতি নয়ন মনুরাগমিব স্ফুটং
উদিত রসাভি নিবেশম্।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব
মাবদ কৈতব বাদং
তামনুসর সরসী রুহ লোচন
যা তব হরতি বিষাদম্

(গীতগোবিন্দ—অষ্টম ১-২)

অর্থাৎ—ওহে কেশব ! ওহে মাধব, গেল রাত্রিটা যে তোমার জেগে থেকেই কেটেছে, তা বুঝতে পারছি, তোমার দুটি চোখ রাঙা হয়ে আছে এখনও। আর ঝিমিয়ে পড়ছে চোখের সঙ্গে তোমার দেহও, কেন তা ? মনে হচ্ছে কোন প্রেমিকার প্রেমরসই অমনতর করছে তোমায়, কৃষ্ণ ! থাক্‌, আর বাক্‌ চাতুরীর প্রয়োজন নাই, তোমার এ জড়তা বিষাদ যিনি দূর করতে পারেন, তাঁর কাছেই যাও।

এখন প্রশ্ন ওঠে মানব মানবীর মনেরগতি যখন অফুরন্ত হয়েও ৯টি বা ১৪টি থেকেই ওঠে তাহলে এই মান কি কেবল মানবীর মনেই জাগে ? অমনতর বৃত্তি কি মানবের মনে জাগে না ? কৈ পুরুষের মন নিয়েতো ওই ধরণের রসানুভূতির আশ্লেষ প্রসঙ্গে কোন কাব্যেরই জন্ম হয় না ?—

কারণ শৃঙ্গার রতির একেন্দ্রিয়তায় অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, প্রশস্তি, উদ্বেগ, অনিষ্টাশঙ্কা, এমনকি উন্মত্ততা ও তো উভয়ের সমান, সেক্ষেত্র শুধু নারীর মন নিয়েই বা কেন এই অপহ্নুতি ? এ সম্পর্কে

এই 'অমরু' কবিরই কিংবদন্তী কাহিনীতে বলা হয় আচার্য শঙ্কর নাকি শৃঙ্গার রসের একেন্দ্রিয়তায় অজ্ঞ থাকার দরুণ মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেও, সময় চেয়ে নিয়েছিলেন অচিরেই জবাব দেবেন। কাম কলার সূক্ষ্মবিচার ধারা জানতে হলে কোন্ দেহের আশ্রয় নিলে তা সম্পূর্ণ জানা যাবে? এর উত্তর পেয়েছিলেন নিজেরই অনুভূতিতে যে, উচ্চশ্রেণীর রমণীই এবিষয়ে গুরুর কাজ করতে পারেন, তাই অচিরে মৃত রাজা 'অমরুর' দেহে যোগ শক্তির দ্বারা নিজের মন বুদ্ধি প্রবেশ করিয়ে অমরুকে জীবিত করেন। তারপর বেশ কিছুদিন যোগবলে প্রবিষ্ট সেই শঙ্করই 'অমরু' হয়ে রাণীর কাছে দার্শনিক ভিত্তিতেই শৃঙ্গার রসের 'কাম কলা' শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মণ্ডন পত্নীকে শৃঙ্গার রসেরবিত্তাতর্কে পরাজিত করেন।

'অমরু শতক' কবিতাবলী সেই যোগপ্রবিষ্ট দেহী আচার্য্য শঙ্করেরই রচনা। এই শতক গ্রন্থের টীকাকার অর্জুন বর্মা (১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের)। তিনি সম্ভোগ, অভিসার এবং খণ্ডিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বৃত্তির কেন্দ্রথেকে অভিলাষ প্রভৃতির জাগরণ হয়েও যে সেই বৃত্তিগুলি রমণীর দেহ মনেই লাবণ্য সৃষ্টি করে বেশী এইটাই দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ যাঁরা বলেন রমণীর স্বাতন্ত্র কেড়ে নিয়ে পুরুষ কুল যে কাল থেকে তাদিকে ভোগ্য মাত্র করে নিয়েই নিজের এক কেন্দ্রিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে শৃঙ্গার রস ভোগ করেছে সেইদিন থেকেই রমণীর মনকে নানান্‌ভাবে প্রশস্তি রচনার দ্বারা তাকে ঠকিয়ে চলেছে। আসলে মানব মানবীর উভয়ের মনেই আছে কৌতূহলী বৃত্তি। উভয়েই উভয়ের দেহ প্রাণকে সেই কৌতূহল বৃত্তি দ্বারা ভোগ করতে চায় এবং তা নূতন নূতন দেহ প্রাণ নিয়ে।

কিন্তু পুরুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে বড় করে দেখার জন্যই এবং নারীদেহের মধ্যে কিছু অংশ অসহায় থাকার জন্যই পূর্ণসুযোগ নিয়ে অপহৃ তি সৃষ্টি করেছে। পরে তাই হয়েছে শৃঙ্খলা রক্ষা, সমাজ প্রাণতা, মাতৃপূজা, নারীগৌরব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রশস্তি বাক্যের ছড়াছড়ি।

অর্জুন বর্মা কিন্তু এমন ধরণের তাত্বিক ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলেছেন

রমণ্যস্তলাবণ্যাধারাঃ, যথা লাবণ্যং
মুক্তাস্বেব, ন তথান্তত্র অপিচ শোণিত
স্রোতসাং ইয়মেব প্রকৃতিঃ, মনশ্চশোণিত
জীবতে প্রতিষ্ঠতম ॥

অর্থাৎ রমণীর দেহটাই লাবণ্যের আধার। আর লাবণ্য এমনি বস্তু যে যা মুক্তায় থাকে তা অন্যত্র থাকে না, যা কুসুমে থাকে তা দুগ্ধে থাকে না। যা হাসিতে থাকে তা অগ্নি শিখায় থাকে না। এমনি বিভিন্ন বস্তুতে সেই এক লাবণ্যই বিরাজ করে, কিন্তু তা বীজে নয়, তা আধারে। দেহের শোণিত স্রোতে থাকে আধার-আয়তন, মন ও সেই জীবনের আধার আয়তনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রমণীর দেহটাই তো আধার। তাই নারীর মনও তার দেহকেই সজ্জিত করে সুখী হয়। কারণ বীজ-আধার তার দেহ।

অর্জুন বর্মার এই ভাষ্য অমরুর বক্তব্যকে যে ভাবে পরিস্ফুট করেছে, তাতে মনে করা হয় অমরুর শৃঙ্গার শতক যে অতীন্দ্রিয় সত্বায় লীলাবাদকে অস্বীকার করেই রচিত হয়েছে সেটায় বিতর্ক

থাকেনা। কয়েকটা নমুনা দিই—

তবে প্রথমে বলে নিই পবিত্র শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা থাকলে তা হবে অশ্লীল। কিন্তু শৃঙ্গার রস অশ্লীল নয়। তবে যাঁরা তাকে অতীন্দ্রিয়ের লীলা বাদ স্থাপন করার প্রয়াসে লোকায়তিক রীতির সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বাদদিয়ে তাকেও অতীন্দ্রিয় করতে চান অমরুর শতভাষিতায় তা উপেক্ষণীয়।

আলংকারিকদের চিরকালীন মনস্তত্বে নিরুপিত হয়েছে যে, মানব মানবীর মধ্যে যে শৃঙ্গার-লাবণ্য, সেটি অহেতুক কখনই হয়না, এটা যে কোন দেহপ্রাণের সাংগঠনিক রূপে। তবে ভাষায় লক্ষণীয় মানব মানবীতে—

শৃঙ্গার-লাবণ্যের বিকাশ হয় সম্ভোগে। সেটির হেতু থাকে (১) অনুরাগে, (৩) মান-অভিমানের পর (২) প্রবাস সমাপ্তিতে (৪) করুণ বিরহ ব্যথার পর। তথাপি পূর্ণ মাধুর্য্যের রূপ সেই সম্ভোগে। অমরুর ভাষায় পূর্বের হেতুগুলির উল্লেখ নাই সম্ভোগের রূপ আছে—

কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং তৎক্ষণাৎ
তদ্ বাসঃ শ্লথ মেখলা গুণধৃতং কিঞ্চিৎ নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেদ্মি কেবলমহং তস্যাঙ্গ সঙ্গে পুনঃ
কেহসৌ কাস্মি রতং তু-কিং কথমিতি স্বল্পংচ ন স্মর্য্যতে ॥

এখানের বক্তব্যটিতে অতীন্দ্রিয়তার কিছুই নাই, কিন্তু যাঁরা বলেন এতে অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব আছে এবং সেই শক্তিই পুরুষ রমণী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভেদাভেদ আত্মায় লীলা করেন বলে লীলা বাদের বর্ণনায় শৃঙ্গার রসকে শুচিশুদ্ধ রসের অবতারণায় রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার বর্ণনা করেন তাঁরা কিন্তু সেই লোকায়তিক অনুভূতিরই আশ্রয় নেন ;—তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্রীরাধার মানের পর (এটি ২য়ধারায়) সম্ভোগ বর্ণনা করতে লিখেছেন—

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষণ চ
ক্রীড়াকূত বিলোকনেঽধরসুধা পানে কথানর্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথ কলা যুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ
দুদ্ভূতঃ স তয়ো বভূ র্ব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥

গীতগোবিন্দ। ১২। ১০

কবিতায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়

তনু হল রোমাঞ্চিত গভীরালিঙ্গনেপ্রীত
বাধাহয় বুকে বুক বাঁধিতে।
সম্ভোগেতে একি দায় নিমীলিত আঁখি হায়
প্রিয়ামুখ নাহি পারে দেখিতে ॥
চুমু যবে পেতে চায় প্রেমসুখ বাক্য তায়
দূরে রেখে হয় অন্তরায়।
বাধাতে যে এত সুখ হর্ষ শুধু,নয় দুখ

সুরত হইলে চের পায়॥

লীলাবাদে সম্ভোগ বর্ণনা করতে গিয়ে জয়দেব যেটি উপস্থাপিত করেছে তা আর অতীন্দ্রিয় নাই—

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধর-ভরেণা পীড়িত পার্শ্বিজঃ
আবিদ্ধঃ দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণী-তটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধর সুধা পানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামাগতিঃ

অনুবাদ—

শ্রীরাধাভুজের ডোরে প্রিয়কে বাঁধিয়া জোরে
পয়োধর ভারে চাপে বক্ষ।
সবলে চিবুকটানি অধরে দশন হানি
সম্ভোগ সুখ তাঁর লক্ষ।
হরি দেহ কাছে নিয়া বিপুল জঘন দিয়া
আঘাতিল রাধা, রতি মন্দে।
রতির বিচিত্র গতি পীড়নেতে হর্ষ অতি
বুঝিলেন শ্রীহরি আনন্দে॥

মোটকথা অমরুর একশতটি কবিতার মধ্যে তিনি সংস্কৃতভাষার রীতিতে বহু ছন্দ ব্যবহার করে যে চিত্রজল্প রচনা করে গিয়েছেন সেগুলি কিন্তু অলংকার সর্বস্ব বা অতিশয়োক্তিতে ভরে তাকে ভারি করেন নি।

তিনি এমন মন নিয়ে চিত্রকল্প রচনা করেছেন যেগুলি প্রকৃতই বাস্তব ধর্মী।

অর্থাৎ চার চার পংক্তিতে এক একটি কবিতাকে এমন ভাবে গেঁথেছেন, যেগুলিকে অবলম্বন করলে মনস্তত্ত্ব মূলক গল্পের যে ছক্ আঁকা যায়—তা নিঃসন্দেহ।

মোটকথা অল্প কথায় একটা গল্পের ছক্ আঁকতে হলে বেছে বেছে যে সব শব্দ চয়ন করতে হয় অমরু তা করেছেন।

এইজন্য তাঁর শত কবিতাকে বলা যায় এগুলি 'চিত্রজল্প' কাব্য। এই চিত্রজল্প হলো দশ প্রকার (১) প্রজল্প (২) পরিজল্প (৩) বিজল্প (৪) উজ্জল্প (৫) সংজল্প (৬) অবজল্প (৭) অভিজল্প (৮) আজল্প (৯) প্রতিজল্প ও(১০) সুজল্প।

অমরুর চিত্রজল্প যে সেই সপ্তম শতকেই গুণীজনের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তার চিত্রই যে মানব মানবীর মনের চিরন্তনী বৃত্তি, তাকে ফুটিয়ে তুলতে বহু তৈল চিত্রকার বহু প্রয়াস পেয়েছিলেন : দেখা যায় পশ্চিম ভারতে প্রিন্স্-অব্-ওয়েল্সের সংগ্রহ শালায়, দিল্লীর জাতীয় চিত্র-শালায়, কাশীর ভারতকলা ভবনে অমরুর কবিতা মালার এক একটি কবিতা চিত্রিত হয়ে আছে।

অন্য একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়—খাজুরাহো ও কোনারক এবং জগন্নাথের মন্দিরে যে চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন হয়, সেগুলিকে যদি ৭ম শতকের অমরুর কবিতার অর্থ, এবং 'আনন্দ সর্বস্ব' 'শৃঙ্গার তিলক' 'বাৎস্যায়ন' 'সময় মাতৃকা' 'কুট্টনী-মতম্' গ্রন্থের শ্লোকার্থ বা চিত্রজল্পের দিক নিয়ে ব্যাখ্যা

করা যায় তবে প্রত্যেকটি চিত্রই আমাদের অতীত ভারতের মনস্তাত্ত্বিক চিত্রের কাহিনী যে নিহিত আছে, তা নিঃসন্দেহ।

এই অমরুকে বিস্তৃত করে জানা দূরে থাক—স্বল্প করেও জানতে গেলে বিফল প্রয়াস হতে হয়; কারণ পণ্ডিতরা কতকগুলি ব্যতিরেক কারণ ধরে অনুমান করেছেন যে—

যেহেতু ৮ম শতাব্দীর আলংকারিক বামন তাঁর কাব্যালঙ্কারে অমরুর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এবং ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আনন্দবর্ধনাচার্য্য তাঁর ধ্বন্যালোকে অমরুর কবিতা তুলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, অতএব অমরু তাঁদের আগেই জন্মেছিলেন। কেউ কেউ এমন অভিমত ও পোষণ করেন যে অমরুর পূর্বসূরী ভর্তৃহরি নন তাঁর সমসাময়িক এবং কালিদাস ও এমন বেশী দিন আগের নন।

সেইজন্য একটা অনুমান ইতিহাস খাড়া করতে অমরুকে ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ধরা হয়।

অমরুর কাব্য বলতে এই এক খানিই পাওয়া যায়। নাম 'অমরু শতক'।

এই শতক গ্রন্থটির ২খানি টীকা আছে। একটি ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের অর্জুন বর্মার, আর একটি ১৫ খ্রীষ্টাব্দের বেমভূপালের শৃঙ্গার দীপিকা।

আর একটি টীকাও পাওয়া যায় তার নাম শৃঙ্গার তরঙ্গিনী। রচয়িতা সূর্যদাস। শেষোক্ত ব্যক্তিটি কত শতকের তা জানা যায় না।

অমরু শতক শৃঙ্গার রস প্রধান এবং প্রসাদ গুণ সম্পন্ন। বলা যায় এই অমরু কবি শতভাষী ও চিত্রজল্পক।

স্তম্ভ

চিত্ররেখা গুপ্ত

বিশাল ভারতবর্ষের নগরে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে কত না দ্রষ্টব্যস্থান! অতীতের সাক্ষ্যকে বহন করে উৎসুক দর্শকের আশায় আজও তারা অপেক্ষমান, দেবতার মন্দির, রাজার প্রাসাদ, বেগমের সমাধি, নবাবের জলসাঘর কল্পনার সোনার সুতোয় যোগসূত্র স্থাপন করে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। প্রাচীন যুগের বহু বিচিত্র এই সৌধগুলি তাদের বিরাটত্ব, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট দিয়ে আমাদের আকর্ষণ করে, আর তাই আমরা সহজেই ভুলে যাই সেই প্রস্তরখণ্ডগুলিকে যারা আকাশের দিকে মাথা তুলে নেহাৎই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এই পাথরের ভাষা যারা শুনতে পায় তাদের শ্রবণ অনুরণিত হয়ে ওঠে অতীতের চলমান জীবনের এক ছন্দোবদ্ধ তানে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রস্তরস্তম্ভগুলি হয়তো একই গোত্রীয়—একটি পাথরকে কেটে তৈরী করা; কিন্তু গঠন বৈচিত্র্যে তারা আপন আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তারও চেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই স্তম্ভগুলি স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর, এদের অনেকগুলিও ছিল সাধারণ মানুষেরই তৈরী।

ঐতিহাসিক কালে সম্রাট অশোকই প্রথম এ ধরণের শিলা-স্তম্ভ স্থাপন করেন। তাঁর অনুশাসন প্রজাদের মধ্যে প্রচার করাই ছিল এই স্তম্ভগুলির উদ্দেশ্য। এই স্তম্ভগুলির মাথায় থাকতো সিংহ, গরু ইত্যাদি কোন জীবজন্তুর মূর্তি। অংশগুলো ছিল পৃথক পাথরে গড়া। উচ্চতায় এরা আনুমানিক ২১ফুট থেকে ৪৪ফুট পর্যন্ত হত।

অশোকের শিলাস্তম্ভগুলি রাজার প্রচারের মাধ্যম হলেও সেখানে আত্ম-প্রচারের প্রচেষ্টা তেমন প্রকট নয়। পরবর্তীকালের অনেক রাজাই এ ধরণের শিলাস্তম্ভকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের কীর্তির ঘোষক হিসেবে। এগুলি 'জয়-স্তম্ভ' নামে পরিচিত। মধ্যপ্রদেশের এরাণে পাওয়া সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি অথবা ম্যান্তাসোরে পাওয়া যশোধর্মনের প্রশস্তি এরই সমগোত্রীয়। এই স্তম্ভগুলিকে অনেক সময় 'কীর্তি-স্তম্ভ' ও বলা হয়। তবে সাধারণতঃ ঐতিহাসিকেরা জয়-স্তম্ভ ও কীর্তি-স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য করেন। বিজয়ীর প্রশস্তি সমন্বিত শিলা-স্তম্ভকে বলা হয় জয় স্তম্ভ। আর যে প্রশস্তিতে কোন পুণ্যকর্মের কথা লেখা থাকে, তাকেই বলা হয় কীর্তি-স্তম্ভ। দক্ষিণ ভারতের তালগুন্ডায় প্রাপ্ত কদম্বরাজা কাকুস্থবর্মণের প্রশস্তিটি কীর্তি-স্তম্ভ গোত্রীয়। কেবলমাত্র রাজারাই যে নিজেদের গুণগান করে প্রশস্তি রচনা করতেন, তা নয়। রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও কখনও কখনও প্রস্তরস্তম্ভে নিজেদের প্রশস্তি করে গেছেন। বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাদলে পাওয়া নারায়ণ পালের রাজত্বকালের প্রস্তর-স্তম্ভটী তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গুরবমিশ্রের প্রশস্তি। স্তম্ভটির উপরে একটি গরুড়ের প্রতিকৃতি ছিল।

দেবতার উদ্দেশ্যে স্তম্ভদানের রীতিটিও বেশ পুরোনো। এগুলিকে বলা হয় ধ্বজা-স্তম্ভ। মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে এ ধরণের একটি স্তম্ভ পাওয়া গেছে। লিপির পাঠ থেকে জানা যায়, তক্ষশীলার গ্রীক অধিপতি এন্টিয়ালকাইডাসের দূত হিসাবে হোলিও ডোরাস এসেছিলেন শুঙ্গ রাজা

ভাগভদ্রের সভায়। ভারতবর্ষে এসে তিনি ভাগবত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভগবান বাসুদেবের সম্মানার্থে এই গরুড়-ধ্বজ সমন্বিত স্তম্ভটি দান করেন।

ভারতীয় ধর্ম-চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আরও এক ধরণের প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া যায়। এগুলিকে বলা যায় যূপ-স্তম্ভ। মথুরার ইসাপুর গ্রামে পাওয়া কুষাণ সম্রাট বাসিষ্কের সমকালীন যূপ-লিপি, রাজস্থানের উদয়পুরের নিকটবর্তী নান্দসা গ্রামের দুটি ও কোটা রাজ্যের অন্তর্গত বড়বা গ্রামের তিনটি যূপ-লিপি এদের মধ্যে অন্যতম। কোন একটি যজ্ঞ সম্পাদনের পর যজ্ঞস্থানে যূপ-স্থাপন করার রীতি ছিল। ইসাপুরের যূপ-স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দ্রোণলেন দ্বাদশ রাত্রি যজ্ঞান্তে এটি স্থাপিত হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের 'মেগালিথিক' কৃষ্টির অধিকারীরা মৃতদেহের উপর স্থাপন করতো সমাধি স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলি থেকেই গড়ে উঠেছে মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় স্তম্ভ স্থাপনের রীতি। জীবিত ব্যক্তি যেমন নিজের পুণ্য অর্জনের জন্য দেবস্থানে স্তম্ভ দান করতেন, তেমনি মৃতের জন্যও ধর্মস্থানে স্তম্ভ স্থাপনের প্রচলন ছিল। মধ্যপ্রদেশের ভূমারায় এ ধরণের দুটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। একটি স্তম্ভের লিপি থেকে জানতে পারি যে, এ রকম শিলা-স্তম্ভকে 'বল-যষ্ঠি' ও বলা হত। গ্রাম মুখ্য বর্গ তার সগোত্রীয় কিছু আত্মীয়ের স্মৃতির সম্মানার্থে এই স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন। তাই এটিকে বলা হয়েছে 'গোত্র -শৈলিকা বলযষ্ঠি'। ভূমারার স্তম্ভটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু বোঝা যায় যে জনৈক শিবদাস তার মৃত কোন পরিজনের মুক্তি কামনায় এই স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন।

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য ভারতবর্ষে আরও এক ধরণের স্মরণ-স্তম্ভ প্রচলিত ছিল। তাদের পারিভাষিক নাম ছায়া-স্তম্ভ। দেবমন্দিরের কাছে অথবা পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর ধারে এই এই ছায়া-স্তম্ভগুলি স্থাপন করা হত, ছায়া-স্তম্ভের উপরের অংশে অনেক সময় মৃতের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকতো, নাগারজুনীকোণ্ডায় ইক্ষাকুবংশীয় রাজা মহাসেনাপতি কুমার এলী এহবুলদাসংনকের যে স্মরণ-স্তম্ভটি পাওয়া গিয়েছে তাতে মৃতের প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু পাওনিতে মহাক্ষত্রপ রুপি অংমের ছায়া স্তম্ভে একটি অর্ধপদ্ম উৎকীর্ণ আছে। নাগারজুনী কোণ্ডার আর একটি ছায়া স্তম্ভে ইক্ষাকুরানী বসংভটাকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। শুধু রাজবংশীয় লোকেরাই নয়, অনেক সময় সাধারণ ব্যক্তিরাও ছায়া-স্তম্ভ স্থাপন করতেন। যেমন দক্ষিণ ভারতের কুড্ডাপা জেলার গংগপেরুতে পাওয়া ছায়া-স্তম্ভটি করা হয়েছিল জনৈক শিবদাসের সম্মানার্থে। মলবল্লিতে পাওয়া একটি লিপি থেকে জানতে পারি, জনৈক কীর্তির পুত্র বাচপ্প তার দাদা তম্মরপ্-পর মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়া বায়িচাক্কার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে দাদার প্রতিকৃতি সমন্বিত একটি শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেন। ছায়াস্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতির হাতে অনেক সময় একটি প্রদীপ দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় ছায়া-দীপ। শ্রীকুরজনের মন্দিরে গঙ্গরাজা তৃতীয় ভানুদেব তাঁর পিতা তৃতীয় নরসিংহদেব এবং বিমাতা গঙ্গাম্বিকার দুটি ছায়া বা প্রতিকৃতি দান করেন। এই প্রতিকৃতি দুটির হাতের ছায়া দীপ দেবতাকে করতো সম্মানিত, মৃতের আত্মাকে দিত শান্তি।

রাজার কীর্তিকাহিনী প্রচারের জন্য যেমন জয়-স্তম্ভ স্থাপিত হত, তেমনি কোন ব্যক্তি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখা হত বীরস্তম্ভের মাধ্যমে। মধ্যপ্রদেশের

শিবপুরজেলার বংগলা গ্রামে বরুণা নদীর ধারে চোদ্দটি বীর-স্তম্ভ পাওয়া গেছে। এই স্তম্ভগুলির ওপরের অংশে কোথায়ও অশ্বারোহী, কোথায় বা গজারোহী বীরমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। কোথায়ও বা দেখতে পাই যোদ্ধাকে পরিবৃত্ত করে রয়েছ স্বর্গের অপ্সরীরা। এই স্তম্ভগুলির লিপি থেকে জানা যায়, ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ চান্দেল্লরাজ বীরবর্মণ জজপেল্লরাজ গোপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। গোপালদেবের বীর সৈন্যদের কাছে বীরবর্মণ পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে যে সমস্ত বীরেরা গোপালদেবের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে এই স্তম্ভগুলি তৈরী হয়েছিল। লিপির পাঠ থেকে জানা যায়, এই যুদ্ধে অনেক পিতা ও পুত্র একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন; অনেক স্ত্রী বীর-স্বামীর সঙ্গে গিয়েছেন সহমরণে।

স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার রীতি প্রাচীন ভারতে ছিল, যদিও তা কখনই স্ত্রীর আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করা হত না। সহমরণের পুণ্যকর্তব্য যে সমস্ত সহধর্মিণী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন তাদের গৌরবান্বিত করা হয়েছে সতীস্তম্ভের মাধ্যমে। মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার বালোদ গ্রামে যে সতীস্তম্ভটি পাওয়া গিয়েছিল তাতে একটি স্তম্ভে তিনজন সতীর উল্লেখ আছে। প্রাচীনতম লিপিটি আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের। মধ্যপ্রদেশের এরাণে গুপ্তযুগের একটি সতীস্তম্ভ পাওয়া গেছে। রাজা ভানুগুপ্তের সহচর গোপরাজ এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান এবং তাঁর স্ত্রী সহমরণে অনুগামিনী হন। শিলালিপিটির ওপরে গোপরাজ ও তার স্ত্রীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। লিপিটি পড়তে গিয়ে আমরা এই ভেবে আশ্চর্য্যবোধ করি যে, গোপরাজ যে রাজার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন এখানে তাঁর নাম দেওয়া আছে, দেওয়া আছে গোপরাজের পিতৃ-পরিচয়, মাতৃকুলের ইতিবৃত্ত। কিন্তু যে সাধ্বী চিতার জলন্ত আগুনে নিজেকে নিঃশেষিত করেছিলেন তাঁর নামটি রইল আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

স্তম্ভ পরিক্রমার সমাপ্তি পর্য্যায়ে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতের স্তম্ভগুলির অধিকাংশই পাথরের হলেও, কাঠের বা ধাতব পদার্থের স্তম্ভও অপরিচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী যূপস্তম্ভগুলি তো কাঠেরই হওয়া বিধেয়। হয়তো এমন বহু স্তম্ভই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু কালের আঘাত সহ্য করে টিঁকে থাকবার ক্ষমতা এই উপাদানটির খুবই কম। তাই এখনও পর্য্যন্ত মাত্র একটি দারুস্তম্ভই আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের কিরারি গ্রামে এই স্তম্ভটি পাওয়া গেছে। বর্তমানে লম্বায় এটি ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। এর উপরের অংশ কলসাকৃতি। এই স্তম্ভটিতে একটি লিপিও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লিপিটির বর্তমান অবস্থা থেকে বিশেষ কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

এ প্রসঙ্গে দিল্লীর বিখ্যাত মেহেরৌলী স্তম্ভটিরও উল্লেখ করা যায়। ঝড়বাদলকে উপেক্ষা করে মসৃণ এই স্তম্ভটি কত যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি কোন বিখ্যাত রাসায়নিকের উদ্ভাবনী কৌশলে লৌহনির্মিত হয়েও এর কোনখানেই পড়ে না মরচের চিহ্ন। পণ্ডিতেরা যখন পুঁথি খুলে ভাবতে বসেন; কে ছিল এই স্তম্ভলিপির চন্দ্র। সাধারণ দর্শকেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন এই অসাধারণ স্তম্ভটির দিকে। স্তম্ভলিপির ভাষা না জেনেও তাঁরা বুঝতে পারেন অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা।

চারিদিকে শুধু জল

হেমন্তকুমার সরকার

একটা গল্প আছে দুজন হাঙ্গেরীয় বড়লোক সম্বন্ধে—তারা দুজনে একদিন ঠিক করল যে কে কত বড় সংখ্যা বলতে পারে দেখা যাক্। একজন অনেক চিন্তা করে, মাথা খাটিয়ে তার জানা সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা বলল,—'তিন', দ্বিতীয়জন বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল—বলল,—'ভাই, তুমিই জিতেছ', ব্যাপারটা হল এই যে তাদের দুজনের কেউই তিনের থেকে বড় সংখ্যা জানত না।

গল্পটা ধার করা। তবুও এটা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে। ঠিক এখনই যদি আপনাকে প্রশ্ন করা যায়—'মশাই, বলুন তো জল কত রকমের হয়?'—তবে হয় আপনি আমাকে পাগল ভেবে বসবেন, কিম্বা সুকুমার রায়ের অবাক জলপানের সেই বৈজ্ঞানিকের মত গুণতে শুরু করবেন—'কলের জল, খালের জল, বিলের জল, ডাবের জল, চোখের জল,...'। আবার আপনাদের মধ্যে কেউ যদি রসায়ন পড়ে থাকেন তাহলে হয়ত বলতে পারেন—'তিন রকমের'। ঠিক এই প্রশ্নটাই কোন রসায়নবিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিন্তু বলবেন—'আরও বেশী'।

জল নিয়ে এই ঘাঁটাঘাঁটি করার কারণ একটাই—বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং তদুপরি এক সরলতম রাসায়নিক পদার্থ হল জল। জল ছাড়া বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন, কোন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ঠিক এই কারণেই বহির্বিশ্বের কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না তার খোঁজ করতে গেলে বৈজ্ঞানিকেরা যে কয়েকটা জিনিসের খোঁজ করেন, তার মধ্যে প্রধানতম একটি হল—জলীয় বাষ্প বা জলের অস্তিত্ব সেখানে আছে কি না। অথচ রসায়নের দিক দিয়ে জল খুবই সাধারণ একটা পদার্থ—দু'টো হাইড্রোজেনের পরমাণুর (হাইড্রোজেন—একটি মৌল পদার্থ যার এক পরমাণুর রাসায়নিক চিহ্ন হল H) সঙ্গে একটি অক্সিজেনের পরমাণু (অক্সিজেন, যার একটি পরমাণুর রাসায়নিক সঙ্কেত O) যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে অণু জল যার রাসায়নিক পরিভাষা বা সঙ্কেত H_2O।

এবার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন,—এই দুটো পরমাণুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক্। আজপর্য্যন্ত যে ১০৬টি মৌলের আবিষ্কার হয়েছে হাইড্রোজেনের গঠন তাদের মধ্যে সরলতম। এর কেন্দ্রে একটা প্রোটন (প্রোটন—ধণাত্মক কণা যার ভর ধরা হয় ১) রয়েছে আর তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ইলেকট্রন (ইলেকট্রন—ধ্বণাত্মক কণা, এর ভর প্রোটনের তুলনায় নগণ্য)। সবমিলিয়ে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ধরা হয় ১ এবং একে চিহ্নে লেখা যেতে পারে H-1। অক্সিজেনের ভর পাওয়া গেছে হাইড্রোজেনের ১৬ গুণ। এর গঠন একটু জটিল। একটা অক্সিজেনের আছে আটটা ইলেকট্রন (যাদের সমষ্টিগত ওজন নগণ্য) এবং কেবল মাত্র আটটা প্রোটন (অর্থাৎ মোট ওজন ৮); আর এই প্রোটনের সাথেই পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ৮টি একধরণের কণা নিউট্রন (নিউট্রন—বা উদাসীন কণা ও এদের প্রত্যেকের ভর ১)। অর্থাৎ অক্সিজেনের রাসায়নিক সঙ্কেত Q-16 বা অক্সিজেন—১৬।

এই হাইড্রোজেন-১ এর দুটো পরমাণু ও অক্সিজেন-১৬ এর রাসায়নিক সংযোগেই এক অণু

সাধারণ জলের (H_2O) জন্ম। ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়; আরও দু'রকমের হাইড্রোজেন আছে—হাইড্রোজেন-২ ও হাইড্রোজেন-৩। এদের বলা হয় হাইড্রোজেন সমস্থানিক। প্রোটিয়াম ডিউটারিয়াম এবং ট্রিটিয়াম। কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যাভেদে এই সমস্থানিকদের জন্ম ও অস্তিত্ব। এরা প্রত্যেকেই অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরী করতে পারে; অর্থাৎ তিনরকমের জল হতে পারে—প্রোটিয়াম, ডিউটারিয়াম এবং ট্রিটিয়াম জল।

এছাড়াও আবার মিশ্র জল হতে পারে। ধরুন আপনার কাছে দুটো নীল, দুটো হলুদ, দুটো লাল এবং একটা সাদা গুঁটি আছে। আপনি দুটো নীলের মাঝে একটা সাদা, বা দুটো হলুদের মাঝে একটা সাদা, অথবা দুটো লালের মাঝে একটা সাদা বসাতে পারেন; কিম্বা একটা নীল ও একটা লালের মাঝে একটা সাদা বা একটা হলুদ ও একটা লালের মাঝে একটা সাদা গুঁটিও বসাতে পারেন। এই দ্বিতীয় রকমের সাজানোকেই আমরা মিশ্র সংযোজনা বলব। সুতরাং এক পরমাণু প্রোটিয়াম এক পরমাণু ডিউটারিয়াম এক পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে HDO জল তৈরী করতে পারে, অথবা এক পরমাণু ডিউটারিয়াম ও এক পরমাণু ট্রিটিয়াম যুক্ত হতে পারে এক পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে। এই ভাবে তিনরকমের মিশ্র জল পাওয়া যেতে পারে—HDO, DTO, HTO।

এ তো গেল হাইড্রোজেনের কথা, এবার অক্সিজেনকে নিয়ে পড়া যাক্। অক্সিজেনেরও আবার তিনটে প্রাকৃতিক সমস্থানিক পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকেই যদি প্রোটিয়াম ও ট্রিটিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরী করে তবে হিসেব করলে পাওয়া যাবে আরও বার রকমের জল; অর্থাৎ মোট বিভিন্ন রকমের জলের সংখ্যা হল আঠার এবং সবচেয়ে মজার কথা কথা হল এই যে রসায়নবিদেরা এই আঠার রকম জলেরই আলাদা আলাদা বিশুদ্ধ অণু পরীক্ষাগারে তৈরী করতে পেরেছেন।

ধরুন আপনি বনভোজনে গেছেন—সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব, বন্ধুপত্নীরা ও ছেলেমেয়েরা আছে। জায়গা বেছে নিয়েছেন হয়ত কোয়েলের তীরে, বা লুপুংগুটুর মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসা জলস্রোতের ধারে, অথবা কোন এক নাম-না-জানা ঝির্ ঝির্ ঝরে যাওয়া ঝরণার পাড়ে;—সবাই মিলে জলে নেমে পড়েছেন আঁজলা আঁজলা জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেললেন আর তারপর কয়েক চুমুক জল খেয়ে ফেললেন। আপনাদের মধ্যেই কেউ হয়ত বলে উঠলেন—'বাঃ! জলটা বেশ মিষ্টি তো!' আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাবধান করে দিতে পারেন,—এখন আর 'জলটা' বলা চলবে না, কারণ এখন আপনি জেনে গেছেন যে ঐ এক আঁজলা জলের মধ্যে লুকিয়ে আছে আঠার রকমের বিভিন্ন ধরণের জলের অণু। বরং তাঁর কথাটা শুধরে দিন—'বাঃ! বেশ মিষ্টি জল তো'

বুদ্ধিমান পাঠকদের কেউ কেউ হয়ত চেপে ধরতে পারেন যে এই আঠার রকমের জলের অণুগুলোর গুণাগুণ কি একই!—মোটেই নয়। এরা প্রত্যেকেই এক একটা আলাদা ধরনের অণু। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম ভরের অণু হল সাধারণ জল বা প্রোটিয়াম জল ও সবচেয়ে ভারী অণু হল ট্রিটিয়াম জল ভর ছাড়াও এদের ঘনত্ব, গলনাঙ্ক বা কঠিনাঙ্ক ইত্যাদির মধ্যেও পার্থক্য থাকতে পারে। তবে এদের রাসায়নিক গুণের সাধারণতঃ কোনপার্থক্য হয় না। শুধু তাই নয়, মজার কথা হল এই যে এক এক জায়গার জলে এই বিভিন্ন আঠার রকমের অণুর মোট পরিমাণও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি রোজ এক লিটার করে জল খান। এরকম ভাবে এক হাজার দিন খেলেই

পেটের মধ্যে প্রায় একটন ওজনের জল চলে যাবে, আর তার সঙ্গে আপনার অজান্তেই প্রায় ১৫০ গ্রাম ভারী জল বা D_2O চলে যাবে আপনার পেটে। সমপরিমাণ প্রশান্ত মহাসাগরের জলে কিন্তু এই D_2O-র পরিমাণ আরেকটু বেশী—প্রায় ১৬৫ গ্রাম। আবার যদি ককেশীয় হিমবাহ থেকে একটন বরফ কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারেন তবে তার মধ্যে হয়ত D_2O পেয়ে যাবেন প্রায় ৭ গ্রাম। বিভিন্ন ধরণের জলের মধ্যে সাধারণ জলের ব্যবহারই বেশী হয়ে থাকে। অবশ্য অন্যান্য ধরণের জলেরও ব্যবহার আছে—বিশেষ করে ডিউটারিয়াম জল বা ভারী জল তো আণবিক বৈজ্ঞানিকদের অনেক কাজে লাগে।

পাঠক, আপনি তো আঠার রকমের জলের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, কিন্তু আমি নারাজ, —করার কিছুই নেই। কারণ ঠিক এই সময়েই রসায়নবিদ্ মুচকি হেসে বলে ফেলেছেন—'বাপু হে, তুমি তো প্রাকৃতিক জলের কথাই শুধু বললে, কৃত্রিম জলের কথাটা কে বলবে? অতএব আরেকটু জল ঘোলা করা ছাড়া উপায় নেই।

রসায়নবিদ্ ও পদার্থবিদেরা তিনরকমের অক্সিজেন সমস্থানিক প্রকৃতিতে খুঁজে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। পরীক্ষাগারে নানাধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তাঁরা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন—আরও বেশ কয়েকটা কৃত্রিম সমস্থানিক তৈরী করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। অক্সিজেনের চারটে—অক্সিজেন-১৪, অক্সিজেন-১৫ অক্সিজেন-১৯ ও অক্সিজেন-২০ এবং হাইড্রোজেনের আরও দুটো—হাইড্রোজেন-৪ ও হাইড্রোজেন-৫।

এই সব কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক সমস্থানিকের প্রত্যেকেই একে অন্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরণের জলের অণু তৈরী করতে পারে। আসুন না, কাগজ কলম নিয়ে একটু অঙ্ক করতে বসা যাক এই সব প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সমস্থানিকেরা নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে কত বিভিন্ন ধরণের জলের অণু তৈরী করে। সবরকমের সম্ভাব্য সংযোজনের রাসায়নিক সঙ্কেত লিখে ফেলুন। এবার গুণতে চেষ্টা করবেন না কি? আসুন, আরেকটু সাহায্য করা যাক্—সঠিক সংখ্যাটা ১০০-র ওপর। একটু হাত এবং মাথা চালালেই সংখ্যাটা বের করে ফেলতে পারবেন।

শঅর লোঢ়া ঃ একটি আদিবাসী সম্প্রদায়

নিত্যরঞ্জন বসু

দুমকা শহর থেকে সামান্য দূর হিজলা পাহাড়। হিজলা শেষ হতেই মাহারু নদী সুরু। নদীর ওপারে আবার ছোট ছোট পাহাড়ের অবস্থান। হিজলার কাছাকাছি যেখানে মানুষের বসতি শেষ হয়েছে সেই অঞ্চলটিতে ডোমরদের বাস। সাধারণভাবে বলতে গেলে ডোমরপাড়ার পরে আর বসতি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আশেপাশে শালবনের ফাঁক ফোকরে একটি দুটি মানুষ দেখা যায়। বর্তমান সমীক্ষক ঐরকম শালবনের ফাঁকে একজনকে দেখতে পেয়ে তাকে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন সুরু করেন। সামনের মানুষটি খানিক চুপ করে সমীক্ষকের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়। মিনিট দশেক বাদে লুঙ্গি ও সার্ট পরা এক মাঝ-বয়েসী মহিলা এসে হাজির। দূর থেকে সেই পুরুষ মানুষটি তখন সব লক্ষ্য করছে। সমীক্ষককে যে কয়টি প্রশ্ন মহিলা করলেন তাতে বোঝা গেল পুলিশ সম্পর্কে তাদের ভীতির অন্ত নেই। যে পুরুষ মানুষটি খানিক আগে ছুটে চলে গিয়েছিল তার পালানোর কারণও একই। কিছু সময় ধরে কথাবার্তার পর মহিলার আস্থা এল এবং তিনি সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন। বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে কথায় একটা সুর লাগিয়ে তিনি বললেন, 'হামরা শঅর লোঢ়া।'

হিজলায় এই শঅর লোঢ়ারা বীরভূম থেকে গতবছর চলে এসেছে। এসেছে মোট ১৭টি পরিবার। আসার কারণ, বীরভূমে পুলিশ নাকি অকারণে তাদের হয়রানি করত। বীরভূমের আগে তারা ছিল উড়িষ্যার বারিপাদায়। সেখানেও নাকি পুলিশ খুব অত্যাচার করত।

ইতিপূর্বে বা বর্তমানে চাষবাসের সঙ্গে শঅর লোঢ়াদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা এদের কৌলিক উপাধি 'শঅর কোটাল' এবং 'শঅর ভকত' বলে উল্লেখ করে। নামের ব্যাপারে এদের কোন বাছবিচার নেই। চুহা, সাইকেল, টিনা, সিগারেট প্রভৃতি নাম বর্তমান সমীক্ষাকালে সংগৃহীত হয়েছে। এই ১৭টি পরিবারে মোট শঅর লোঢ়ার সদস্য সংখ্যা হল ৫২। বারিপাদায় বসবাসের আগে ওরা কোথায় থাকত—সমীক্ষকের এই প্রশ্নের উত্তরে মীনা কোটাল যা বলেছেন তাতে জানা যায় যে, শঅর লোঢ়ারা চিরকাল যুদ্ধ করে এসেছে। এখন আর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় না তাই ওদের কোন কদর নেই। যোদ্ধারা চাষবাস করে না তাই স্বাভাবিক কারণে ওরা কোনদিন চাষ করেনি। নির্দিষ্ট বসবাসের ব্যাপারও ঐকারণে নেই। এক প্রৌঢ়া মহিলা, গিলাস ভকত বললেন, 'আপনার রামরাজা বনে ঘুমতে ঘুমতে আসে হামাদের মাইয়া লোকের হাতে একবার কুল খায়ে ছিল। অউর জানেন পুরীর জগড়নাথ তো হামার নীলমাধব। রাজা খুঁজে পেয়ে লোক আনে তুলে নিয়ে ছিল।'

শঅর লোঢ়াদের প্রধান দেবতা বলতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর এবং এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শীতলা ও চণ্ডী। ডোমরপাড়ার শেষে একটি পরিত্যক্ত ঘর অধিকার করে আছে দুটি লোঢ়া পরিবার, তাদের দেওয়ালে সাপ এবং ত্রিশূল আঁকা আছে এবং নাগরী হরফে নতুন লেখা

হয়েছে 'জয় শম্ভু।' ঐ ঘরের আরেকদিকের দেওয়ালে লেখা আছে, 'লোঢ়া মুন্না চোর হায়।'

সমীক্ষক ২।৩ দিনের চেষ্টাতেও কোনরকমে ওদের পেশার ব্যাপারটা জানতে পারেন নি। অবশ্য পরিচ্ছদ ও বাসস্থলে যে দারিদ্রের ছবি প্রকট তাতে কোন নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপার নেই বলেই অনুমিত হয়েছে। চুহা কোটাল এবং আরো দুজনকে সমীক্ষক রাস্তায় দৈহিক কসরৎ দেখিয়ে লোকের কাছে পয়সা চাইতে দেখেছেন।

অনুমান হয় আদিবাসী লোধা কোমের একটি শাখা এই শঅর লোঢ়ারা। শঅর কথাটা যে শবর থেকে এসেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লোধারা ও নিজেদের শবর হিসাবে চিহ্নিত করে। কতকগুলি পুরনো প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বর্গী আক্রমণের সময়ে ভীতগ্রস্ত ভূম্যধিকারীরা উড়িষ্যা থেকে বহুসংখ্যক শবর জাতীয় আদিবাসী আমদানী করেছিলেন। ধনপ্রাণ রক্ষার কাজে এরা দক্ষতা দেখিয়েছিল। তখন বন কেটে এদের চাষবাসের সুযোগ করেও দেওয়া হয়। কিন্তু চাষের কাজে লাগানো বা নির্দিষ্টস্থানে বসবাসের ব্যাপারে তখন থেকে আজ পর্যন্ত এদের কিছুতেই বশ করা সম্ভব হয়নি। এরা যে একসময় উড়িষ্যা থেকে এসেছিল সেই অনুমানের ভিত্তি একটু শক্ত হয় এদের নিজেদের লোকশ্রুতি থেকে। উড়িষ্যার লোককথায় জানা যায়, রাজা প্রতাপ রুদ্র স্বপ্নে জানতে পারেন যে স্বয়ং বিষ্ণু নীল মাধব রূপে উড়িষ্যার বনে রয়েছেন। স্বপ্ন অনুসারে সন্ধান করে নাকি জগন্নাথের দারুমূর্তি পাওয়া যায় (অবশ্য জগন্নাথ প্রসঙ্গে ভিন্ন লোককথাও প্রচলিত আছে)। পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার লোধা সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজেদের 'লোরা' বলে থাকেন। এই 'লোরা' ই বিহার সীমান্তে এসে 'লোঢ়া' হয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত বোধহয় ভ্রান্তিমূলক নয়।

এদের দেবতাদের প্রধান হল শাল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মহুয়া গাছ। অবশ্য দেবতা হতে হলে গাছের কিছু বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই। মলা এবং বরাম গাছের কাছে লোঢ়ারা খাদ্য চায়, গাছ বলে দেয় বনের মধ্যে কোথায় খাদ্য আছে। তারপর সবাই মিলে যায় সেই খাদ্যের সন্ধানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা বন থেকে খাম-আলু সংগ্রহ করে। কেউ কেউ এখানে ওখানে দৈহিক খাটুনির কাজ করে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। সামান্য সঞ্চিত অর্থ শেষ হলে আবার কাজের চেষ্টায় যায়। এদের পোষাকে দারিদ্র্যের ছাপ ছাড়া কোন বিশেষত্ব নেই।

শঅর লোঢ়াদের পরব বলতে আলাদা করে বিশেষ কিছু নেই। বর্তমান সমীক্ষকের যেটি নজরে পড়েছে তার কৃত্যগুলি প্রায় বিঁদা, ছাতা এবং জিতা পরবেরই অনুরূপ। একদল পুরুষ নাচতে নাচতে বনের গভীরে চলে গেল, আরেকদল কতকগুলি ছেঁড়া কাপড়ে তৈরী তাঁবুর মত একটি চাঁদোয়া ধরে থাকে। প্রথম দল সেই আগের মত নাচতে নাচতে ফিরে আসে। চোখে মুখে প্রবল নৈরাশ্যের ভাব। তখন ছত্রধারী দলের ভেতর থেকে একজন হাঁক দিল, 'ঝিতিয়া না পাই।' মুহূর্তে সাতজন মহিলা ছুটে এল। তাদের পাঁচজন চলল আগে আগে এবং দুজন আলাদাভাবে পেছন পেছন। এরা বনের দিকে এগোতে থাকে। এবার সেই প্রথম দল এদের অনুসরণ করে গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে যখন এল তখন প্রত্যেকের হাতে একটি করে পাতাসুদ্ধ মহুয়ার ডাল। ছত্রধারী দল এবার গান সুরু করল : গজপতি গজ গজ, রঙ্কমায়ে দেকৃথ ধ্বজ। গান চলতে চলতে সেই নারীবাহিনী ফিরে এল তিনটি সজারু হাতে করে। এই সজারু শিকার দিয়ে 'শঅর লোঢ়া'রা সেদিন পরব শেষ করে।

স মা লো চ না

স্মৃতির অতলে। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা-১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলি-২৯ এবং ১এ এবং ৩২ কলেজ রো কলিকাতা-৯। দাম—৭টাকা

বইখানির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১৫ বছর আগে। মনে আছে রসিক মহলে কিরকম সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে বইখানি হাতে এলো। শ্রীসান্যাল তিনজন গুণী সঙ্গীত কলাবিদদের গান শুনেছিলেন সুদূর অতীতে। সেই সঙ্গে অবশ্যই আরো অজস্র গান বাজনা এতাবৎ কাল তিনি শুনে আসছেন। আপাততঃ স্মৃতির অতলে যে সৌন্দর্য্যের সম্ভার প্রায় অবহেলায় লুপ্ত হতে বসেছিল তার কিছুটা এজগতের সঙ্গীত রসিকদের কাছে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সম্পদ হয়ত তিনি ছাড়াও কিছু কিছু সঙ্গীত রসিকদের কাছে ছিল যেমন শ্রীদামোদর খান্না (লালাবাবু) যিনি বই খানির প্রথম প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কৃপণের ধনের মতই বোধকরি আগলে রেখেছিলেন সে সম্পদকে। অবশ্যই প্রকাশ করার অক্ষমতাও একটা কারণ হতে পারে কেননা শ্রীসান্যালের স্মৃতির যাথার্থ্য ও সেই সঙ্গে অনুপম প্রকাশ ভঙ্গীর ক্ষমতা বোধহয় 'কোটিতে গুটিক' মেলে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর সেতারশিক্ষার বই 'যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকাতে' প্রারম্ভেই বলে নিয়েছেন যে রাগসঙ্গীতের ওপর গানকরা বাজনা বাজানোর চেয়েও শক্ত। সান্যাল মহাশয় অনেক বিখ্যাত গাইয়ে ও বাজিয়েদের নাম করেছেন যাঁদের গান বা বাজনা এখনও তাঁর স্মৃতির মণি কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীকলাবিদদের প্রসঙ্গ উৎসাহের ব্যঞ্জনায় উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু স্মৃতির অতল থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন তিনজন পুরুষ গাইয়েকে। বাজিয়েদের নাম বা স্ত্রী গায়িকাদের নাম কোথাও বা তুলে ধরেই অতলে ছেড়ে দিয়েছেন আবার কোথাও বা কাকেও প্রসঙ্গের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য সর্বসমক্ষে হাজির করেছেন। বইখানি পড়লেই বোঝা যায় যে পুরুষ গাইয়েদের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ পাতিত্ব আছে। বোধকরি সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ ও মাল্‌কাজান বাঈজীর কথোপকথন তুলে ধরে ফৈয়াজের মুখ দিয়ে পুরুষের গানের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার কথা বলিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া আর এক পক্ষপাতিত্বের কথাও বলি, যে কথা আগেও বলেছি, যে বইখানি তিনজন গাইয়ের প্রসঙ্গে। যন্ত্র সঙ্গীত বাজিয়েদের কথা উল্লেখ করলেও সেটা ওই উল্লেখ পর্য্যন্ত। সুকৌশলে প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তাঁর মতামতও ব্যক্ত করেছেন। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে যন্ত্র সঙ্গীতকে 'শুষ্ক' আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন 'বাদ্যং গীতানুবর্ত্তীচ' অর্থাৎ কিনা বাজনা গানের সঙ্গত হিসাবেই প্রযোজিত হয়। অমিয়বাবু তাঁর 'প্রাচীনভারতের সঙ্গীত চিন্তা' বইখানিতে এই উদ্ধৃতির

প্রতিধ্বনি করে কণ্ঠসঙ্গীতকে মনোরঞ্জনকারী হিসাবে যন্ত্র সঙ্গীতের ওপরে স্থান দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে 'স্মৃতির অতলের' বক্তব্য অবশ্য অন্যরকমের। তিনি বলেছেন যে এটি তাঁর রচিত একখানা দলিল বিশেষ যেটা সঙ্গীতের রথকে একচাকায় বসিয়েছে এবং কেবল কথার খই ফুটিয়ে এগিয়ে গেছে। এটাকে সাহিত্য প্রচেষ্টা হিসাবে চালাতে তিনি নারাজ। তিনি বলেছেন 'সঙ্গীতের রথ চলে তিন চাকায়,—কথা, সুর ও ছন্দের ত্রিচক্রে। তখন সারথী হন গুণী গায়ক' অর্থাৎ সুর ও ছন্দের যন্ত্রসঙ্গীত,-বিচক্র রথকে, প্রথমেই তিনি পেছনে ফেলে রেখেছেন। তারপর বলেছেন 'মূল রথ ঐ তিনচাকা মাত্র দিয়েই চলে। দুরদৃষ্টের ফলে সুর ও ছন্দের চাকা অচল হয়ে গেলে থেকে যায় শুধু কথার চক্র। আমার মত নাছোড়বান্দা তখন হয় একচাকার ঠেলা গাড়ীর গাড়োয়ান।' সুতরাং শুধু কথা দিয়েই সঙ্গীত পরিবেশনের ভার তিনি বেছে নিয়েছেন নিরুপায় হয়ে। কিন্তু এতে তাঁর আক্ষেপের অন্ত নেই তাই বলেছেন, 'ঐ তিন চাকার গাড়ীর কাছে আর সব গাড়ীকে হার মানতে হয়েছেরে ভাই। ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা। গানাৎ পরতরং নহি।'

বাস্তবিক বইখানি পড়তে পড়তে যথার্থ সঙ্গীত রসিকদের কখন বা মনে হবে তিনি হঠাৎ পড়া ছেড়ে গান শুনছেন। তাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয় যে তৃপ্ত হবে তা প্রায় হলফ্‌করে বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

সঙ্গীত প্রেমী মাত্রেই রেডিও বা গ্রামোফোনে গান শুনে খুশী নন। শিল্পীকে আসরের মধ্যে বসিয়ে গান শুনেই তৃপ্তি পান। গানের আসর বলতে অবশ্য ১০ হাজার লোকের সমাবেশ 'প্যাণ্ডেল কালচার' নয়,—যথার্থ রসিকদের ছোট্ট আসর যেখানে শ্রোতারা পৃথিবীর আর সমস্ত কাজ কর্ম চিন্তা ভাবনা ছুড়ে ফেলে কেবল সঙ্গীত রসেই মশগুল হতে চান এবং উদগ্রীব আকাঙ্খা নিয়ে আসরের সমস্ত কথাবার্তার অংশীদার হতে চান। সান্যাল মহাশয়ের কৃপায় পাঠক এমনি সব অতীতের আসর,—শ্যামলালজীর বৈঠকে বা নাটোরের মহারাজার মাইফেলে নিজের উপস্থিতি অনুভব করবেন। শ্যামলালজীর বৈঠক,—১০১ নং হ্যারিসন রোডে দোতালায় ফরাশ বিছানো ঘর···মৈজুদ্দিনের গানের আশায় ননী ও আমি সন্ধ্যা হতে না হতেই জমেছি গান কখন হবে কিছু ঠিক নেই···গুরুজীর বৈঠক যেন এক একটা 'হট্-হাউস'। গুণী আর গুণমুগ্ধ লোকেরা এসে তাপ সঞ্চয় করে নিতেন নানা রকম আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, নানা রকমের জল্পনা কল্পনা করে। এধরণের একটি বৈঠকে যখন সঙ্গীতের যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে এবং কিছু থোসগল্পও চলেছে তখন উপস্থিত হলেন আগ্রাওয়ালী মালকাজান বাঈজী। সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এলেন।···দুজনেরই চেহারা দেখবার মতন সমাদর করবার মতন। রিক্ত বৈঠকের যেন শ্রী ফিরে এলো।'—এই গেল বৈঠকের পরিবেশ। তারপর দুজনের রূপ বর্ণনা। বৈঠকে থাকলে পাঠকও বোধহয় এই একই দৃষ্টিতে দুজনকে দেখতেন মায় মাল্‌কার ডঠাম 'অধর প্রান্তে ভ্রমরের মত কুচকুচে এক কালো তিল।' আর ফৈয়াজের 'চৌখশ মুখমণ্ডলে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি; তার বাঁধটি ছিল ওঠাধরের সংযত রেখায়।' এরপর মালকার শান্ত, সংযত মধুর যৌবনশ্রী ও ফৈয়াজের খানদানী চেহারাও সাজ সজ্জার কথা বলে নিজেদের মধ্যে হাস্যকৌতুকের হালকা আবহাওয়ার সৃষ্টি বিবৃত করে সুকৌশলে ফৈয়াজ খাঁ কে গজল গানের আসরে নামিয়ে ফেলায়

যে ছবিটি সান্যাল মহাশয় তুলে ধরেছেন তারপর পাঠকের মনে যে ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠে ভীমপলশ্রী রাগের উপক্রমণিকা দিয়ে বাঁধা গজল খানি শুনতে পাচ্ছেন যার বর্ণনা খালি কানেই বেজে ওঠে। 'মধ্যম-গান্ধার রেখাবের তর্পণ সেরে সুরের মধু পঞ্চমে এসে ঢেলে দেয়।' আবার 'পঞ্চম নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়েছে; মধ্যম গান্ধার রেখাবও ক্ষণিকের গোপন রহস্য জানিয়ে চলে গেছে...তবুও মনে হল যেন গানের ফুলটি তখনও দুলছে পঞ্চমের আবেগে, যেন জানিয়ে দিচ্ছে অতৃপ্ত বাসনা—আবার ফিরে এসো, পঞ্চমকে সার্থক করো। সে পিপাসা তো মেটেনি।'

বইখানি পড়লে কেবলই মনে হবে যে সৈয়দ মুজতবা আলি যেমন কথার জালে সাহিত্যের ফুল ফুটিয়েছেন তেমনি সেই একই প্রথায় সঙ্গীতের ফুল ফুটিয়েছেন শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। আধুনিক সঙ্গীত সমালোচকদের মতন ভাসা-ভাসা মতামত ব্যক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। গাইয়েদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার পর তাদের মুখের গানের তাৎপর্যটুকু প্রকট হয়ে পড়েছে এবং রাগের মধ্যে বিভিন্ন পর্দার জৌলুস ও নানান ধরনের তান কর্তব্যের বোধ, বক্তব্যের বিশিষ্ট ভঙ্গীর মাধ্যমে, একেবারে পাঠকের কানের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রথম প্রবন্ধ মৈজুদ্দিনকে নিয়ে। গয়াতে গোবিন্দলালজীর আসরে রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ 'সুশ্রী, গৌরবর্ণ পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষ' মৈজুদ্দিন ঢুকেছেন। 'এর মাথায় ছিল একটা সবুজ রঙের পাগড়ী এবং পরিধানে আদ্দির ঢিলা পাঞ্জাবী এবং যোধপুরী ঢংএর পায়জামা।...'আলগা পাঞ্জাবী ও ঈষৎ বাঁয়ে হেলান পেঁচদার পাগড়ীর মধ্যে দিয়ে মৈজুদ্দিনের মুখে ফুটে উঠেছিল বিনয় ও সরলতার ছবি। চোখের দুই প্রান্তে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সুর্মার লাবণ্য রেখা। চাহনী স্বাভাবিক হলেও চঞ্চল সপ্রতিভ কটাক্ষে মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।...মৈজুদ্দিনের কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসা জোছনার মত' এমনি একটি রোমান্টিক পুরুষ রোমান্টিক কণ্ঠস্বর নিয়ে গাইলেন পুরিয়া রাগে ঢিমা ঠেকায় একটি রোমান্টিক ভাষা সম্বলিত গান 'সুপনমে আয়ে।' পরিবেশটি সম্পূর্ণ রোমান্টিক সুতরাং 'সমের ঠিক পরেই খাদের গান্ধার থেকে মুদারার কোমল রেখাব পর্য্যন্ত একটি মীড়ের অপূর্ব জ্যোতিরেখা মনকে বিহ্বল করবে বইকি। সেইসঙ্গে পাঠককেও বিহ্বল করে তোলে যখন সান্যাল মহাশয় মৈজুদ্দিনের সারা উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে নাটকীয় পর্য্যায়ে উন্নীত করেন, যখন বেনারসের বিখ্যাত মোতি বাঈজীর জলভরা উদাস চোখে মৈজুদ্দিনের কবর দেখিয়ে বলে ওঠেন 'হমারা মৈজুদ্দিন', সেই গল্প শুনিয়ে।

লেখক যেমন মৈজুদ্দিনকে ঘিরে এক রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন তেমনি ওস্তাদ কালে খাঁর পরিচয় করিয়েছেন সম্পূর্ণ বিরূপ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। তাঁকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় গুণ্ডার সর্দ্দার। তাঁর মলিন বেশ দরিদ্র জীবন আর সারা গা চুলকানিতে ভর্তি। তাঁর মুখ দিয়ে উতরি রেখাবওয়ালা মহাদেব বন্দনার বন্দেশে অশোয়ারী গান শুনিয়েছেন যার জোড়া নাকি তিনি কখনও শোনেন নি। গানখানি মহারাজ শ্রীআনন্দকিশোরের রচনা তার বন্দেশ হল,

তুঁয়া চরণ কমল পর মন ভ্রমর
ভাল ভাগু, যঁউ চন্দ-চকোর ॥ ইত্যাদি

এই গান প্রসঙ্গে যেটুকু ব্যাকরণের কচ্‌কচি আছে সেটুকু সঙ্গীতানুরাগীদের অনুধাবন করার জিনিস।

কোমল রেখাব যুক্ত আশোয়ারী গানের বিশুদ্ধতা রাখা কঠিন। একটু অসতর্ক হলেই জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী বা দেশীতোড়ীর ভেজাল এসে পড়ে আবার জোর করে কোমল রেখাব লাগালে বিলাসখানি বা খট্ ভৈরবীর দর্শন মিলবে। আমাদের প্রাচীন গান 'বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ লোকে বলে তোমায় করুণা নিধান' তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া শ্রীআনন্দকিশোর রচিত গানখানির অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের গান 'তব অমলপরশ রস তব শীতল শান্ত পুণ্যকর, অন্তরে দাও' গানখানির স্বরলিপি লক্ষ্য করলে বা গান করলে সান্যাল মহাশয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কালে খাঁর মুখে এই গানখানি যে বিশিষ্ট ভাব ও রূপের সঞ্চার করেছিল তার অনেকটা পাঠকের কানে এসে ধরা দেবে এই অংশটুকু পড়লে।

কণ্ঠসঙ্গীত মাত্রেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার সময় সে কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। কণ্ঠসঙ্গীতে ভাষা ও তার ভাবের বাহার শিল্পীর চেহারায় কিছুটা ফুটে ওঠে আর সেই সময় সঙ্গীতও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। অমিয়বাবু বলছেন যে, 'হোরী ঠুমরীর কথা বাদ দেওয়া যাক, ধ্রুপদ, খেয়াল গানেও যে বিশিষ্ট রকমের মুখবিলাস, অর্থাৎ চোখ মুখ ও কটাক্ষের সমুচিত ভাবভঙ্গী প্রয়োজন, মাটির পুতুল বা ঈজিপ্সিয়ান মমীর মত মুখ করে গান গাইলে নায়কীর ও গায়কীর শোভা নষ্ট হয়ে যায়—এ ব্যাপার জেনেছিলাম শ্যামলালজীর সংস্পর্শে এসে।'

সঙ্গীত সমঝদারীতে সৌন্দর্য্য তত্ত্ব অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে তর্কের ঢেউ উঠেছে। প্রশ্ন করা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মধ্যে কতখানি অধিকার করে রয়েছে রূপ আর কত খানিই বা ভাব ও রস। বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি তর্কে প্রতীচ্যের মুনি ঋষি আরিষ্টটল, প্লেটো থেকে আরম্ভ করে মোজেল, পিয়ের, বেল্লনী, হান্সলিক ইত্যাদি সঙ্গীত বেত্তারা যোগ দিয়েছেন এদিকে প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের সৌন্দর্য্য তাত্ত্বিকরা, ভরত, শার্ঙ্গদেব, অভিনবগুপ্ত ইত্যাদি মনীষীরা ভাব ও রসের স্ফূরণ দেখছেন গানের মধ্যে। অমিয়বাবুর মত এই দুই এর মাঝখানে বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে! তাই মৈজুদ্দিনের গলায় রেখাব ষড়্‌জ নিখাদের একটি সুরের কণায় পেয়েছেন 'সপ্রেম অভিমানের একটি মাত্র কটাক্ষের মত সতর্ক ও মধুর' অভিব্যক্তি আর 'উদারার নিখাদ থেকে মুদারার কোমল ধৈবত পর্য্যন্ত একটি মীড়—অভিমানের অন্তে যেন হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য্য যা উছলে পড়ছে একটি মাত্র অশ্রু রেখার মধ্যে।' অন্যদিকে ভীমপলশ্রী রাগের রূপকে পেয়েছেন পঞ্চমের বাহারে। মিঞা মল্লারে দেখেছেন দুই নিখাদের কারচুপি আর দরবারীর আলাপ শুনে কোমল-গান্ধারের সম্মোহন বাণে মোহিত হয়েছেন। তাঁর কাছে রাগাশ্রয়ী গান হয়ে উঠেছে একটি প্রস্ফুটিত ফুল যার প্রতিটি পাপড়ি তৈরী হয়েছে সুরের ফের আর ছোট ছোট 'মুড়কী' তানের 'ঠোক' দিয়ে।

বইখানি পড়লে বোঝা যায় যে একমাত্র সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলেই সঙ্গীত সমালোচক হওয়া যায় না তার সঙ্গে হওয়া চাই সহৃদয় শ্রোতা। সঙ্গীত আমোদীদের একটা আলাদা জগত আছে।

তাদের সুখ দুঃখ চলাফেরা আদব কায়দা সাধারণ ব্যবহারিক জগতের বাইরে। এই সঙ্গীত জগতের পরিচয় বহন করছে 'স্মৃতির অতলে' বইখানি। এর একদিকে রয়েছে সঙ্গীত গুণীদের কথা আর অন্যদিকে রয়েছে সমঝদারীর প্রক্রিয়া। সঙ্গীত রসিকদের কাছে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। আর যারা খবরের কাগজে বা পাক্ষিক পত্রিকায় সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিতান্তই শিক্ষনবিশী বুলি কপচান তাঁদের অবশ্য পাঠ্য বই এই 'স্মৃতির অতলে'।

প্রকাশক শ্রী কুণ্ডু মহাশয় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যাদের প্রচেষ্টায় এই অমূল্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে তাঁদের কাছে সঙ্গীতরসিকবৃন্দ চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র